তিন টাকা

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীমুরারিভূষণ গুহ

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ—১৩৬৪

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচী

১। দাহ ... ১

২। শিম্পাঞ্জী . ২৩

৩। রাঙামামী ... ৩৮

৪। বাঈজী .. ৫৭

৫। দ্বিধা .. ৭৫

৬। বিস্মৃতি ... ৯০

৭। মথুরাকাঠির মাস্টার ১০২

৮। বেনোজল ... ১১৮

৯। নবজাতক ... ১৩৯

১০। পাপ ... ১৬০

১১। ছায়ানট .. ১৬৮

এই লেখকের :

ইরাবতী (২য় সং)

উপকূল

আরাকান

সপ্তকন্যার কাহিনী

অন্যতমা (২য় সং)

মৃত্তিকার রং

প্রান্তিক

স্বর্ণাহার

বনকপোতী

নারী ও নগরী

স্বপ্নমঞ্জরী

দাহ

স্টেশনের চেহারা দেখেই মেজাজ খারাপ হয়েছিল, ওয়েটিংরুমের ব্যবস্থা দেখে মন খিঁচড়ে উঠল। দর্মার দেয়াল আর টিনের ছাদ। গোটা দুই ভগ্ন-পায়া চেয়ার, একটি দড়ির খাটিয়া, দড়ির সংখ্যা তাতে এত কম যে শরীরের ভার সইতে পারবে এমন আশা দুরাশারই নামান্তর।

বাইরে শেষ-অঘ্রানের শীতের হাওয়া। জামাকাপড় ফুঁড়ে অস্থি-মজ্জায় কাঁপন তুলছে। জমাট কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়-প্রহরীর বিরাট দেহ। ভোরবেলা ট্রেনে চড়েছি আর আসামের এই শেষপ্রান্তে এসে পৌছলুম রাত আটটায়। এতটা সময় শুধু চা জুটেছে কাপ ছয়েক, সঙ্গে প্রায় আড়াই দিনের বাসি পাঁউরুটি। মাঝে মাঝে শীতে শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে, চোখ মুখ বুজে সে ধাক্কা সামলাচ্ছি, কিন্তু অন্ত্রের মোচড়ে কাহিল অবস্থা। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কোন আস্তানা মিলবে এ সম্ভাবনা কম।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েই অবাক। হাতে হ্যারিকেন, মাল-কোচা দেওয়া শার্টের ওপর লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ির আকারে চাদর। লোকটির মুখ দেখা গেল না।

—হোটেল স্যার, গুড হোটেল স্যার।

হোটেল? দাঁড়িয়ে পড়লুম।

—হোটেল আছে এখানে? আনন্দের আতিশয্যে মাতৃভাষাই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

উত্তরও এল নির্ভেজাল বাংলায়, খুব ভাল হোটেল আছে স্যার। হোটেল এনা। গরমজলের বন্দোবস্ত, চুল্লী, সব আছে।

পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে গেলুম।

শাদা দুতলা বাড়ি। সামনে পাহাড়ী গোলাপের ঝোপ। লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, সোজা ওপরে চলে যান স্যার। বাঁ হাতি ঘর। মালপত্র এখানেই থাক।

মালের মধ্যে একটি ছোট শান ব্যাগ সেটি আমার কাঁধেই, আর কম্বল জড়ান বিছানাটা লোকটি আগেই নিজের বগলে তুলে নিয়েছিল।

বারান্দায় কমানো হ্যারিকেন। সেটি তুলে ঘরে ঢুকলুম। স্বল্প-পরিসর কামরা। আসবাবের মধ্যে ছোট টেবিল, একটা চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিল, কাঠের একটা আলমারী, একেবারে কোণের দিকে ছোট্ট খাট। হ্যারিকেনের পলতেটা উস্কে দিতেই নজরে পড়ল, জানলায় শাড়ির পর্দা, টেবিলের ওপর কাচের গ্লাসে মরসুমী ফুলের গোছা।

পিছনে পায়ের শব্দ হতে ফিরে চাইলুম। লোকটি বিছানা নিযে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি একটু সরে দাঁড়াতেই, ঘরের মধ্যে ঢুকে খাটের ওপর বিছানাটা রেখে, দু হাত জোড় করল, স্যার, রাত্রে ভাত না রুটি কোনটা চলে? এই শীতে রুটি হলেই বোধহয় সুবিধা হবে? ক্লান্ত দেহটা ইতিমধ্যে চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলুম। উত্তরে বললুম, তোমার ম্যানেজারবাবুকে একবার পাঠিয়ে দাও। তাঁর সঙ্গে আগে কথা বলে নিই।

—আচ্ছা স্যার। লোকটি সরে গেল।

মিনিট পাঁচেক। জুতো মোজা খুলে সবে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করছি, দরজায় টোকা, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

হাতের দেশলাইটা নিভিয়ে বললুম, ভেতরে আসুন।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে ফিরে চেয়েই অবাক। যে লোকটি স্টেশন থেকে বিছানা বয়ে এনেছিল সেই দাঁড়িয়েছে সামনে। মাথায চাদরের পাগড়ি আর নেই, ধুতিটাও হাঁটু ছাড়িযে কয়েক ইঞ্চি নীচে নেমেছে, গায়ে ছাই-বঙা সোয়েটাব।

—আপনি? গলায় বিস্মযেব প্রলেপ।

লোকটি বিগলিত হবাব চেষ্টা কবল, আজ্ঞে একাধারে আমিই সব। বিদেশ-বিভুঁয়ে এত লোকজনই বা পাই কোথায় বলুন? আপনাদের সেবাব জন্ত এই সামান্ত বন্দোবস্ত। তবে বলতে নেই, পাঁচজনের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে কোনবকমে। জাঁদবেল অফিসব দু একজনও ডাক-বাংলো ফেলে অধীনেব আস্তানায় এসে ওঠেন।

নিজেব হাতেব সিগাবেটটা এগিযে দিলুম, মুখে বললুম, বাংলা দেশ ছেড়ে এত দূবে এসে হোটেল খুলেছেন, আশ্চর্য।

দু হাতেব অঞ্জলিতে সিগাবেটটা নিযে লোকটি মুচকি হাসল, পেট মানুষকে কখন কোথায় নিয়ে যায়, কিছু ঠিক আছে স্যাব।

সাবা হোটেলে আমি ছাড়া অতিথিব সংখ্যা আব গোটা দুয়েক। সকলেব সঙ্গেই খাবাব-ঘবে দেখা হল। একটি আসামী ভদ্রলোক, অন্যটি খাসিয়া প্রৌঢ়। হোটেলের মালিক পবিবেশন অবশ্য করল না, কিন্তু সাবাক্ষণ তদাবক কবল ঘুবে ঘুবে। উপাদেয় রান্না। এমন মুর্গাব ঝোল বহুদিন জিভে ঠেকে নি, এমন কি বাড়িতেও নয়।

কথা হ'ল পবেব দিন ভোবে। মাইল তিনেক দূবে এক পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে মোটব উল্টে পড়ে আছে, আমাকে তার কলকব্জা পর্যবেক্ষণ কবে বিপোর্ট দিতে হবে বীমা কোম্পানীতে। সে মোটরের

হৃৎস্পন্দন চালু করা সম্ভব, না গোটা মোটরটাই লোহালক্কড়ের দামে বিক্রি করা সমীচীন এমন অভিমতও দেওয়া প্রয়োজন।

হোটেলের গেট পার হতেই লোকটির গলা, কতদূর যাবেন স্যার?

গন্তব্যস্থলই শুধু নয়, গমনের উদ্দেশ্যটাও বললুম।

—ও আপনি বুঝি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোক। সার্ভে করতে এসেছেন? চলুন, আমিও ওই রাস্তায় যাবো। এখানকার বাজারটাও ওইদিকেই কিনা।

পথে চলতে চলতেই লোকটি বলল, কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই। দেশ ছেড়েছে বছর দশেকের ওপর। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বুক ঠুকে পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে এই নির্বান্ধব পুরীতে ডেরা বেঁধেছে। প্রথমে ছোটখাট ব্যবসা, তারপর স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে এই হোটেল খুলেছে। প্রথম কয়েক বছর খুব কষ্ট, দু বেলা পুরো পেট ভাতও জুটত না, তারপর ভগবানের দয়ায় আস্তে আস্তে বরাত ফিরেছে। হোটেলের বাড়িটাও কিনে নিয়েছে। বাড়তি একটি ছোকরা বহাল করেছে। বাহাদুর, যে রাত্রে পরিবেশন করছিল। বলতে নেই একরকম ভালই আছি স্যার। কি বলেন?

উত্তরের আশায় লোকটি আমার দিকে চোখ ফেরাল।

—নিশ্চয়, আমি ঘাড় নাড়লুম, সে কথা আর বলতে। চাকরির চেয়ে হাজারগুণে ভাল। কারুর চোখরাঙানি সহ্য করতে হয় না—

—ওটি বলবেন না স্যার, লোকটি বাধা দিল, চোখরাঙানির জের এখনও কাটে নি। একটু ভুলচুক হয়ে গেলেই দু চোখে একেবারে আগুনের ছিটে। ভস্ম করলেও বেঁচে যেতুম, কিন্তু এ একেবারে মরণে মারার দাখিল।

কথাটা বলেই লোকটি আচমকা থেমে গেল। হঠাৎ যেন অন্য কিছু মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব।

সারা পথ আর বিশেষ কথা হল না। কিছুটা এগিয়েই লোকটি বাঁ দিকের ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেল। যাবার মুখে শুধু বলল, চলি, বাজারটা এইদিকে।

আশা করেছিলুম দিন দুয়েকের মধ্যেই কাজটা চুকে যাবে কিন্তু বিধি বাদী। আকাশ কালো হয়ে গেল মেঘের স্তবকে। মাঝরাতে বৃষ্টি নামল। বিরতিহীন। সারাটা দিন চলল একভাবে। কনকনে ঠাণ্ডায় বাইরে বেরোনোই দুষ্কর। কম্বল চাপিয়ে জানলার ধারে বসে রইলুম চুপচাপ।

মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে চুড়ির রিনিঝিনি কানে আসে, নারী কণ্ঠের চাপা কথাবার্তা, কিন্তু ওই পর্যন্ত। মানুষটাকে আর চোখে দেখতে পাই না। স্নান সেরে ফিরে এসে দেখতে পাই বিছানা পেড়ে ঠিকঠাক রাখা হয়েছে, গ্লাসে শুকনো ফুলের বদলে নতুন ফুলের আমদানী, আলনায় রাখা জামাকাপড়গুলোও তেমন অবিন্যস্ত যেন নেই। সব কিছুর মধ্যে কল্যাণময়ী নারীহস্তের স্পর্শ! কিন্তু আসল মানুষটা অলক্ষ্যেই রয়ে গেল।

হোটেলের মালিক—তথা ম্যানেজারের নাম দুর্গাপদ সেন। কথা-বার্তায় স্ত্রীর গুণপনার ব্যাখ্যা করে প্রচুর, তার জন্যই এমন বিদেশ-বিভুঁয়ে করে খাচ্ছে এমন আভাসও দেয়, ব্যস তার বেশি কিছু নয়। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে এমন পর্দানশীন কোন মহিলা থাকতে পারে ধারণাও করতে পারিনি।

দিন দুয়েকের মধ্যেই আসল ব্যাপার জানা গেল। কাজ শেষ করে

হোটেলে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে শাঁখের শব্দ কানে এল। আরো দু-এক-দিনও শুনেছি। হঠাৎ কি মনে হ'ল বারান্দার এ প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম।

ছোট্ট উঠান। মাঝখানে শাদা পাথরের টুকরো জড় করে মঞ্চের আকার দেওয়া হয়েছে। একটি তুলসী গাছ। শীতের প্রকোপে বিশীর্ণ, পাতার সমারোহ নেই বললেই হয়। যে দু একটি পাতা আছে, সে ক'টিও ফিকে সবুজ। তার সামনে একটি বধূ মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। সব মিলে চমৎকার ছবি। বাংলার ঘরোয়া ছবিকে পর্বতাকীর্ণ ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে। এমন একটা ছবিতে শুধু চোখ নয়, মনও ভরে ওঠে। হোটেলের মালিকের গৃহিণী সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না। ভাবতেও আশ্চর্য লাগল। এরই দাপটে দুর্গাপদ তটস্থ। নিরীহ স্ত্রী ব'লে বোধহয় একটু বাড়িয়েই বলেছে ভদ্রলোক।

প্রণাম সেরে মহিলা উঠতেই চমকে গেলুম। প্রদীপের ম্লান আলো, কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল। তা ছাড়া মাঝখানের ব্যবধানও এমন কিছু বেশি নয়। বীভৎস মুখ। চামড়াগুলো কুঁচকে কুঁচকে আঙুরের খোলোর আকার নিয়েছে। পলকের জন্য—তারপরই ঘোমটা টেনে মহিলা ভিতরে চলে গেল।

এত আলাপের মধ্যেও দুর্গাপদবাবু এ দুর্ঘটনার কথা তো বলে নি কোনদিন! স্ত্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু এড়িয়ে গেছে এমন কাহিনী। ঠিক এই কারণেই বোধহয় মহিলাটি সাবধানে আত্মগোপন করে রাখে নিজেকে। কাজের মধ্যে ছাড়া তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। সেবা যত্নে নিজেকে নিবেদন করে, মানুষটা কোনদিন সামনে আসে না।

সে রাত্রেই কথাটা দুর্গাপদবাবুকে বলে ফেললুম। খাওয়া-দাওয়ার

পর গরম চুল্লীর সামনে নিজেদের সেঁকতে সেঁকতে গল্প-গুজব করছিলুম, হঠাৎ বললুম, আজ আপনার স্ত্রীকে দেখলুম দুর্গাপদবাবু।

দুর্গাপদবাবু হোটেলের আয়ব্যয়ের মোটামুটি একটা ফিরিস্তি দিচ্ছিল, এমন একটা প্রশ্নে আচমকা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। আমতা আমতা করল প্রথমে, তারপর সামলে নিয়ে বলল, দেখলেন বুঝি, হেঁ হেঁ, বড় কাজের মেয়েছেলে স্যার। এ হোটেল মাথায় করে রেখেছে।

সেদিকে কান না দিয়ে শর-সন্ধান করলুম একেবারে কেন্দ্র লক্ষ্য করে, এমন একটা দুর্ঘটনার কথা তো আপনি বলেননি কোনদিন ?

—দুর্ঘটনা ? দুর্গাপদ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, বোধহয় পরিমাপ করতে চাইল দুর্ঘটনার কতটুকু আঁচ আমি পেয়েছি।

কি ভেবে দুর্গাপদবাবু এগিয়ে এল আমার দিকে। একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, আপনার হাতে কোন জরুরী কাজ আছে স্যার, এখন ?

একটা রিপোর্ট লেখার ছিল। হেড অফিসকে খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া মোটর-মেরামতের ব্যাপারে, সেই সঙ্গে নিজের কৃতিত্বের কথাটুকুও জুড়ে দেওয়া। পরের মাসে এফিসিয়েন্সির কাঁটাতার আছে একটা, সেটা যাতে নির্ব্বিবাদে পার হয়ে যেতে পারি, তারই প্রস্তুতি। কিন্তু এমন তুহিন-শীতল আবহাওয়ায়, মোটর-দুর্ঘটনার নীরস রিপোর্ট লেখার চেয়ে, মানুষের জীবনের দুর্ঘটনার কাহিনী শোনা অনেক বেশি কাম্য। বাইরের আটত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপের সঙ্গে হৃদয়ের উত্তাপ মিশিয়ে অনবদ্য কাহিনী শোনার আশায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলুম, উহুঁ, জরুরী কেন, কোন কাজই হাতে নেই।

—তাহলে স্যার, ভেতরে একবার বলে আসি। ফিরতে দেরি হলে, আবার উস-খুস করবে। বাহাদুরকে পাঠাবে খোঁজ নিতে।

দুর্গাপদ ভিতরে গেল। আমি চেয়ারটা চুল্লীর আরো কাছে টেনে নিলুম। হোটেল নিস্তব্ধ। জানলার কাচে পাহাড়ী হাওয়া পাগলামী শুরু করেছে। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে হয়তো, কিন্তু উঠে গিয়ে দেখবার উৎসাহ নেই।

মিনিট দশেক। দুর্গাপদ ফিরে এসে চেয়ারে বসল। ঘেঁষাঘেঁষি। দুটো হাত কোলের ওপর জড় করা। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আগুনের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয়, জট পাকানো সুতোর খুঁট খুঁজছে মনে মনে, কিংবা কোনখান থেকে আরম্ভ করবে তাই ভাবছে।

—আমি স্যার গ্র্যাজুয়েট। পাশ করে প্রায় বছর চারেক বেকার বসেছিলুম। জানাশোনা যত খুঁটি ছিল, সবগুলোই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছি একে একে। অফিসে অফিসে টহল দিয়ে শুধু মুচির খরচ বাড়িয়েছি, নিজের বরাত ফেরাতে পারি নি। সংসার নেহাৎ কম নয়। বুড়ো বাপ মা, অথর্ব। দিনের শেষে আশীর্বাদ নয়, কেবল নিন্দা-মন্দ। জোয়ান মদ্দ ছেলে একটা সামান্য চাকরিও জোটাতে পারছি না, এ বয়স পর্যন্ত বাপের পেন্সনে হেলান দিয়ে ফুর্তি করছি এমন সব ইঙ্গিত। কথাটা আংশিক সত্যি। জামাকাপড় আর হাত খরচের কিছুটা জোটে বাপের পঁচানব্বই টাকা পেন্সন থেকে, আর বাকিটা রাত্রের টিউশনি করে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি নয়, বালির বস্তার মতন বাড়তি ভার—জলজ্যান্ত একটি বউ। কলেজে পড়বার সময়ই বাপ বিয়ে দিয়েছিলেন, বারণ শোনেননি, এখন অবশ্য দু বেলা খোঁটা দিতে শুরু করলেন। আপনি পাত্ত পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে, এমন সব

প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, এ শঙ্করাকে আনার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না।

যাক্, শেষকালে দু একজন বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে, শর্টহ্যাণ্ড শুরু করলুম, সঙ্গে টাইপরাইটিং। রাত নিশুতি হলে ফিস ফিস করে স্ত্রীও এই উপদেশই দিল। ওর সম্পর্কে কোন বেকার কাকা বুঝি অতলে ডুবছিলেন, অধুনা বেঁচেছেন এই শর্টহ্যাণ্ডের কুটো আঁকড়ে।

পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দরখাস্ত ছাড়তে আরম্ভ করলুম। কাগজ পড়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনে, বাড়ির দেওয়ালে লটকান বিজ্ঞাপন দেখে। বিধি এবারও বাদী। শিকে ছিঁড়ল না। ছেঁড়া দূরের কথা, শিকে যে আছে কোথাও, এমন সম্ভাবনাও দেখা গেল না। এইখানে দুর্গাপদবাবু একটু থামল। দুটো হাত ঘষতে ঘষতে বলল, একটা সিগারেট পেলে হ'ত স্যার। গলাটা যেন শুকিয়ে আসছে।

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলুম। সঙ্গে দেশলাইয়ের বাক্স। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দুর্গাপদবাবু বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ধোঁয়ার স্তবকের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, হঠাৎ একটা চিঠির উত্তর এসে গেল। রংয়ের কারবার। মালিক পেরেরা সায়েব। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিন্তু লোককে বলেন ইটালিয়ান, অন্তত তিনপুরুষ আগে ইটালিতেই নাকি বসবাস ছিল। পুরোনো ব্যবসা। সম্প্রতি কারবার বাড়াচ্ছেন, সেই সঙ্গে অফিসও। কিছু টাইপিস্ট দরকার।

জানাশোনা যতগুলো দেবতা ছিল সবাইকে স্মরণ করে "ইণ্টারভ্যু" দিতে রওনা হলুম। দু পকেটে বেলপাতা আর ফুলে ঠাস বোঝাই। বাবা ভোর থেকে চণ্ডীপাঠ শুরু করলেন, মা উপবাস। স্ত্রী ছলছল চোখে আর দুরদুর বুকে সঙ্গে সঙ্গে রইলেন।

লোক নেওয়া হবে দুজন কিন্তু প্রার্থী ছেচল্লিশ, তাও অনেক ছাট-

ক্সাট করে। গোটা তিনেক চিঠি টাইপ করতে হ'ল, পেরেরা সায়েবকেও চেহারা দেখাতে হ'ল আধ ঘণ্টা ধ'রে। উদ্ভট সব প্রশ্ন, নানা ঢংয়ের। মেয়ে দেখতে আমাকেও হার মানালো।

যাক, দিন তিনেক পরে সুখবর এল। মাইনে ষাট, মাগগীভাতা নেই, টিফিন খরচ রোজ চার আনা। চাকরি করার ইচ্ছা থাকলে সামনের মাসেব পয়লা থেকেই যোগ দিতে হবে।

বাড়িতে মহোৎসব। বাবা আব মা সুর পালটালেন। বাবা নিজে থলি ঝেড়ে পয়সা দিলেন, বড় দেখে মাছ কিনতে। পয়সা বাঁচলে ওই থেকেই একটু দই। আহা, ছেলেটা ভাল ক'বে খেতেই পায় না। চাকরি, চাকরি করেই হায়রান। স্ত্রী এসব কিছু করল না, শুধু চোখ মুছলো আধ ময়লা শাড়িতে।

মহোল্লাসে চাকরিতে লেগে গেলুম। মইনেব অনুপাতে খাটুনী একটু বেশি। মাঝে মাঝে অন্য কাজ সেবে পেবেবা সায়েব অফিসে ফিরতেন সাড়ে পাঁচটাব পর, তাবপর আমাদেব কাজ শুরু হ ত। একটানা প্রায় আবো তিন ঘণ্টা। কাজ সেরে ফিবতে বাত হ'ত। অনেক দূব থেকেই দেখতে পেতুম গরাদ ধবে জানলায় হেলান দিয়ে স্ত্রী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

মাস ছয়েক পর। স্ত্রীর মামাতো বোনেব বিয়ে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হ'ল। বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছি স্ত্রীকে নিয়ে, হঠাৎ শব্দ করে একটা মোটর এসে থামল একেবারে গা ঘেঁষে। সঙ্গে সঙ্গে জানলার ফাঁকে পেবেরা সায়েবের মুখ ভেসে উঠল, কি খবর সেন, এত ব'াত্রে কোথা থেকে ?

কোথা থেকে বললুম, গলার স্বরে সম্ভ্রমের বেশ মাখিয়ে।

দবজা খুলে পেরেরা সায়েব ডাকলেন, ভেতবে এস, তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাই। কোন দিকে থাকো ?

যে দিকে থাকি সে দিকে পেরেরা সায়েবের থাকার কথা নয়। পেরেরা সায়েবরা থাকেনও না সেদিকে। চাঁদরতন সরকার লেনে বারো হাজারী বুইক ঢুকবে না।

আমতা আমতা করে একবার ক্ষীণ আপত্তি তুললুম, কিন্তু টিকল না। পেরেরা সাযেব আন্তরিকতার আমেজ টেনে বললেন, উঠে এসো, উঠে এসো। দেরি করো না। সঙ্গে কে, স্ত্রী নিশ্চয়।

উত্তরে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পেরেরা সাযেব হাসলেন, তা জানি, বাঙ্গালীরা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক নিয়ে পথেঘাটে বেবোয না।

মোটরে পেবেরা সাযেব ভাঙা ভাঙা বাংলায স্ত্রীর সঙ্গে দু একটা কথা বলাব চেষ্টা করলেন, কিন্তু আভাব দিক থেকে, ওই দেখুন স্যার, দুর্গাপদ জিভ কাটল, স্ত্রীর নামটাই আপনাকে বলা হয়নি এতক্ষণ। আভা একেবারে চুপচাপ। আমার গাযেব সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে বইল।

তাব পরেব দিন থেকেই পেরেরা সাযেবেব হালচাল বদলে গেল। অন্তত আমাব ওপব নেকনজরের মাত্রাটা যেন অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে উঠল।

সন্ধ্যাব পব বসে থাকলে পেরেরা সায়েব নিজে ডেকে পাঠাতেন কামবায। বলতেন, তুমি আর দেরি করো না সেন। তোমার চিঠিপত্র হাজবাকে দিয়েই করিযে নেব। অল্পবয়সী স্ত্রীকে ফেলে রাত অবধি তোমার অফিসে থাকবার দবকার নেই, বিশেষ করে সুন্দরী স্ত্রী।

কথা শেষ করে ঠোঁটে পাইপ ঠেকাবার আগে পেরেরা সায়েব পেঁচিয়ে হাসতেন। দুটো চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। সারাদেহ দুলে দুলে উঠত হাসির আবেগে।

সহকর্মীদের মধ্যেও ঠাট্টার অন্ত ছিল না। বাঁকা বাঁকা কথা, হাড় জ্বালানো ইঙ্গিত। মাথা নীচু করে কাজ করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। মনকে বোঝাতুম, পেরেরা সায়েব প্রায় পিতার বয়সী। আভার ওপর যদি কিছু টান হয়েই থাকে, তবে তা অপত্য-স্নেহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্যাপারটা অন্যরূপ নিল মাস তিনেকের মধ্যেই। চেয়ার ছেড়ে বাড়ি ফেরবার মুখে ডাক এল পেরেরা সায়েবের কামরা থেকে। গিয়ে দাঁড়ালুম। স্তূপাকার ফাইলের আড়াল থেকে পেরেরা সায়েব মুখ তুললেন, সেন, পরশু কোন কাজ আছে তোমার ?

কাজ ! পেরেরা সাযেবের কাজই তো আমার কাজ। কেরানীদের আবার আলাদা কোন সত্তা থাকতে পারে নাকি। ঘাড় নাড়লুম।

ড্রয়ার খুলে আইভরি-শুভ্র একটা কার্ড পেরেরা সায়েব এগিয়ে দিলেন, পরশু খ্রীষ্টমাস। আমার বাড়িতে সামান্য একটু খানাপিনার আযোজন করেছি। তোমার আসা চাই—সস্ত্রীক।

কার্ডটা হাতে নিয়েও অনেকক্ষণ কথা বলতে পাবলুম না। ধন্যবাদ একটা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কথাই মুখ দিযে বেবোল না। আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে গিযে বসলুম।

শুনেছি প্রত্যেক বছরই খ্রীষ্টমাসে খুব ধুমধাম হয পেরেরা সায়েবের বাড়িতে। বহু অভিজাত লোকদের আনাগোনা, কিন্তু তার মধ্যে এ অভাজনকে যেতে বলা কেন, তাও সস্ত্রীক।

কেন যেতে বলা সেটা বুঝতে দেরি হ'ল না। বাড়ি ফিরে আভা চটে লাল। এ আবার কি নিমন্ত্রণের ছিরি। পুরুষরা বসল নীচে লনে, ওপরে কেবল মেয়েদের বন্দোবস্ত। তাও আবার সেখানে পুরুষ বলতে শুধু পেরেরা সায়েব। হেসে হেসে গায়ে ঢলে পড়ে কথা, খোঁপায় ফুল

গুঁজে দেবার চেষ্টা, পরিবেশন করার ছুতোর গা ছোঁয়া। আচ্ছা, ইতর লোক তো!

বিছানায় বসে বসে সব শুনলুম। প্রত্যেকটি কথা। যে কোন স্বামীকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট অনুযোগ। এর পর একটিমাত্র পথই শুধু খোলা থাকে। সোজা পেরেরা সায়েবের নাকের ওপর ইস্তফা-পত্র ছুঁড়ে দিয়ে আসা। স্পষ্ট ভাষায় বলা, মাসান্তে সামান্য কটা রূপোর চাকতির বিনিময়ে, ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। পারিবারিক সম্ভ্রম বাঁধা দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন—নৈব নৈব চ। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল, বছর ঘোরার আগেই দু দফা পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে। কাজের চাপ কিছু কমেছে। কর্তার নেক-নজরের কবোষ্ণ আলোয ডানা প্রসারিত করে আরামের নিশ্বাস ফেলেছি। মা-বাপের গালমন্দর বদলে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনছি, প্রযোজনে অপ্রয়োজনে মা চৌকাঠে এসে দাঁড়াচ্ছেন প্রার্থনার ঝুলি পেতে। বাবা নিজে আসছেন না বটে তবে বৌমাকে পাঠাচ্ছেন ছোট খাটো অভাব-অভিযোগ জানিয়ে। চাকরির রাজতক্তে বসে এ সব সম্ভব হচ্ছে। মেজাজ দেখিয়ে এ চাকরি খোযালে আবার সামনে ধুধু রুক্ষ বিসর্পিল পথ। অফিসের নিষ্করুণ রুদ্ধ দরজার সার। অনশন আর অর্ধাশনে মেশানো এক রাশ অন্ধকার দিন।

কাজেই প্রতিবাদ করলুম, কি যে বল তার ঠিক নেই। তেমন তেমন ইচ্ছে হ'লে পেরেরা সায়েবের আবার মেয়েমানুষের অভাব। বলে, টাকার চাঁদির ওপর বসে আছেন ভদ্রলোক, একটু শুধু ইশারার ওয়াস্তা।

আভা কোন উত্তর দিল না। দু চোখে আগুন ছড়িয়ে পাশের কামরায় গেল কাপড় বদলাতে।

ইতিমধ্যে বাবা দেহ রাখলেন। মাস তিনেকের বেশি থান কাপড় পরতে হ'ল না মাকে। আড়াই দিনের জ্বরে স্বামীর অনুগামিনী হলেন। একেবারে ঝাড়া হাত পা। আশপাশের লোকেদের শুধু দুঃখ বাবা মা নাতি নাতনীর মুখ দেখে যেতে পারলেন না।

পূজোর মুখে পেরেরা সায়েব টেবিলের সামনে এসে হাজির। সন্ত্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

—তোমার ওপর একটা দরকারী কাজের ভার দিতে চাই, সেন।

বিগলিত হলুম। সব মিলিয়ে অফিস আর কারখানায় প্রায় আড়াই শো লোক। তাদের সকলকে সরিয়ে রেখে পেরেরা সায়েব এগিয়ে এলেন আমার কাছে। দায়িত্ব চাপাবার যোগ্যতর লোক কোথাও পেলেন না।

পেরেরা সায়েব দুটো হাত শার্কস্কিন প্যাণ্টের পকেটে ডুবিয়ে দিলেন। গম্ভীর-গলায় বললেন, আমার আসানসোল অফিসের কাজ-কর্ম যেন সুবিধের ঠেকছে না। তুমি খবর 'না দিয়ে একবার চলে যাও সেখানে। খাতাপত্র নেড়ে-চেড়ে দেখ। নজর রাখো অফিসেব হালচালের দিকে। তেমন তেমন কিছু হ'লে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিও।

সব কথা বুঝতে বেশ সময় লাগল। আসানসোলের অফিসরের বেচাল ঠিক করতে যাওয়া দরকার হেড অফিসেব স্বল্প মাইনের একজন স্টেনোর! যে কাজ কোম্পানীর ইন্সপেক্টরদের করবার কথা কিংবা খোদ মালিকের, সে কাজের জন্য ডাক পড়ল দুর্গাপদ সেনের। কিন্তু পেরেরা সায়েবের অফিসের আইন মিলিটারী-ঘেঁষা। কারণ জিজ্ঞাসা করার এক্তিয়ার কারুর নেই। শুধু অবিচলিতচিত্তে কর্তব্য-পালন।

হাতে দুদিন সময়। এর মধ্যেই সব গোছগাছ করে নিতে হবে।

আভা রেগে টং। আচ্ছা বেআক্কেল সায়েব তো। পুজোর সময় ঘরের মানুষকে কেউ বাইরে পাঠায় এমন করে!

নিরুপায়। যেতে হ'ল। পাড়ার এক ছোকরার ওপর আভার দেখাশোনার ভার দিয়ে রওনা হলুম। মনে করেছিলুম দিন চারেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। কিন্তু আসলে দশ দিন লেগে গেল। অফিসবের চালচলনে দোষের কিছু দেখতে পেলুম না, অফিসের কাগজ-পত্রেও না। পেরেরা সায়েব লিখলেন আরো কিছুদিন চেপে থাকতে। যদি নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পাওয়া যায়।

আসানসোলে রহস্যের কোন সন্ধান মেলে নি, সন্ধান মিলল বাড়ি ফিরতে।

আভা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাব ওপর। চোখ মুখ লাল। মনে হ'ল এ দশটা দিন বোধ হয় ঘুমোয নি ভাল ক'রে।

—তুমি এ চাকরি ছাড়বে কি না বল?

এমন চট ক'রে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে বিস্তারিত ব্যাপারটা না শুনে।

তাবপরেই ব্যাপাবটা শুনলুম। এ ক'দিনই পেরেরা সাহেব রোজ এসেছেন এ বাড়িতে। কোনদিন ফলের রাশ নিয়ে, কোনদিন ফুলের গোছা। ইনিয়ে বিনিয়ে আজে বাজে কথাবার্তা।

বেশি শোনাব সময ছিল না। দশটায় হাজিরা। নাকে মুখে গুঁজে অফিসে দৌড়োলুম। চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গে পেরেরা সায়েবের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ইচ্ছা করেই মুখটা ফিরিয়ে নিলুম। এ কি মনোবৃত্তি! এই জন্যই বুঝি আমাকে আসানসোলে পাঠাবার প্রয়োজন ছিল!

—সেন, সময় করে আমার কামরায় এস একবার। পেরেরা সায়েব পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কথার টুকরো ছুঁড়ে দিলেন।

হাজিরা-খাতায় সই ক'রেই সায়েবের কামরায় ঢুকলুম। চিঠিটা টাইপ করাই ছিল, আমি গিয়ে দাঁড়াতেই পেরেরা সায়েব দামী ঝকঝকে কলম বের করে চিঠির তলায় নিজের নাম সই করলেন।

—এই নাও সেন, তোমার কাজে আমি খুব খুশি। সামনের মাস থেকে আমার পারসোনাল স্টেনো হ'য়ে তুমি কাজ করবে। ভৈরব-বাবু ছুটিতে যাচ্ছেন। বয়সও হ'য়েছে, হয়ত ছুটির শেষে রিটায়ারই করবেন।

একবার ইচ্ছা হ'ল সোজা পেরেরা সায়েবের দুটো পা জড়িয়ে ধরি আশ-পাশের লোকের নজর বাঁচিয়ে। শুধু একশ টাকা মাইনেই বাড়ল না, পদমর্যাদা বাড়ল অনেক বেশি। স্টেনোদের মধ্যে কুলীন। পার্টিশন-ঘেরা আলাদা কামরা, বেয়ারা তলব করার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। ধুতি কামিজ বরবাদ ক'রে শার্ট আর প্যাণ্টে সাজাতে হবে নিজেকে। আস্তা-কুঁড় থেকে একেবারে ঠাকুরঘরে।

ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে আসবার মুখেই পেরেরা সায়েবের কণ্ঠস্বর।—তুমি যে ক'দিন ছিলে না, আমি প্রায় রোজই তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখা শোনা করেছি। আমার ধনসম্পত্তি হয় তো নিন্দার নয় সেন, কিন্তু আপনার বলতে আমার কেউ কোথাও নেই। স্ত্রী আর মেয়েকে আমি একদিনে হারিয়েছি। এক ভূমিকম্পে।

শেষদিকে পেরেরা সায়েবের গলায় বেদনার প্রলেপ। দু চোখে অশ্রুর চিকচিকানি।

নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল। আভা যাকে অভব্য ইঙ্গিত ব'লে মনে করেছিল, সেটা শুধু সর্বহারা প্রৌঢ়ের অন্ধ স্নেহের প্রকাশ। আর কিছু নয়। সামান্য কারণে আমরা কত ভুল বুঝি মানুষকে। কত অবিচার করি পটভূমি না জেনে।

বাড়ি ফিরে আভাকে সেই কথাই বোঝালুম।

দুর্গাপদবাবু এখানে থেমে পড়ল। গলা বাড়িয়ে আস্তে বলল, বড্ড বোরিং লাগছে স্যার? রাতও অনেক হ'লো, এবার শোবার বন্দোবস্ত করুন। বাইরে অবিশ্রান্ত তুষারপাত। জানলার শার্সির ওপারে পেঁজা তুলোর মত চাপ চাপ বরফের টুকরো। চুল্লীর প্রায় ওপরে দুটো পা প্রসারিত করে দিয়ে একমনে শুনছিলুম হোটেল-মালিকের কাহিনী। হঠাৎ ছেদ পড়তে নড়ে চড়ে ঠিক হ'য়ে বসলুম। হাতের সিগারেটকেসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম,

—আর অল্পই আছে স্যার। সামান্য ব্যাপার, আপনাদের শোনাবার মতন কিই বা কাহিনী, সিগারেটের মুখ পোড়াতে পোড়াতে দুর্গাপদ-বাবু বৈষ্ণব-বিনয়ে বিগলিত হ'ল। হাত দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি নিভিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিহি-গলায় বলল, তারপর যা বলছিলুম স্যার। আভা একটি কথাও বলল না। আমার কাছেও এল না। কথার মাঝখানেই রান্নাঘরে কি এক কাজের অছিলায় সরে পড়ল।

তার মধ্যে আরো দুবার নিমন্ত্রণ হ'ল পেরেরা সায়েবের বাড়িতে। উপলক্ষ্য বিশেষ কিছু নয়। আভা বেঁকে বসেছিল, বহু কষ্টে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে গেলুম তাকে। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বসবার ব্যবস্থা আগের মতনই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলুম স্যার। আভা ঠিক আর আগের মতন তেমন করে আমার কাছে আসত না। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আসতই না কাছে। সাজ পোশাকের ঝোঁক ছিল, ইদানীং আবরণ আর আভরণ দুটোর ওপরই কেমন তার বিতৃষ্ণা এসেছিল। শুধু মাঝে মাঝে বলত, চল গ্রামের দিকে কোথাও চলে যাই।

—কিন্তু চলবে কি ক'রে? সে কথাও তুলেছি।

হুঁ, আভা ঠোঁট উল্টেছে, দুটি তো মাত্র লোক। তুমি না হয় গ্রামের স্কুলে মাস্টারী নেবে একটা। দুটো পেট তো খুব চলে যাবে।

অন্য হাজারটা অপ্রিয় চিন্তার মতন, এ চিন্তাও মনের অতলে তলিয়ে গেছে। মনের কোণে ঠাঁই পায় নি। বিলাসের অজস্র উপকরণ-জড়ান এমন আমেজী জীবন, পায়ের তলায় নিশ্চিন্ত মাটি, মাসান্তে লোভনীয় নোটের তাড়া, সবচেয়ে বড় কথা অন্নদাতার বরাভয়, তাঁর অনুগ্রহ-উষ্ণ এমন নীড় ছেড়ে ছন্নছাড়া জীবনের পিছনে ঘোরার কোন মোহ নেই। তিল তিল ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। ইঁটের পর ইঁট গেঁথে অট্টালিকা তৈরীর মতন।

আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অফিসের হিতৈষী সতীর্থরাও সায় দিলেন। কোন একটা উপলক্ষ্যে পেরেরা সায়েবকেও একটা পাল্টা নিমন্ত্রণ করা উচিত। প্রথমে কথাটা ভাবতেও সাহস হয় নি। নওলগড়ের নবাবকে পুঁটিরাম বসাকের বাড়ি আমন্ত্রণ! চাঁদরতন সরকার লেনের পাঁজরা-খসা ঝুপসী-অন্ধকার বারোর-দুই নম্বরের দেড়খানা ঘরে বসাবোই বা কোথায় আর খাওয়াবোই বা কি? অনেক ভেবে চিন্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দু হাতে সরিয়ে দিলুম। বিদুরের খুদের উপমাটা মনে এল। হ'লই বা ঘরের আয়তন ছোট, মনের আয়তন তো আর আবদ্ধ থাকবে না তার চতুঃসীমায়। সামান্য আয়োজন—কিন্তু সেই প্রচেষ্টার পিছনে শ্রদ্ধার বহর তো ক্ষুদ্র নয়।

উপলক্ষ্যও একটা জুটে গেল। আভার জন্মদিন। প্রত্যেক বছরেই অনুষ্ঠিত হয়, তবে নিতান্ত ঘরোয়াভাবে। অফিসের বিশেষ দু একটি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে।

এবার নিজে লেগে গেলুম কোমরে গামছা বেঁধে। ঘরের কোণে, জানলার পাশে, খাটের তলায় মাকড়সার জাল, ধুলোর আস্তরণ। সব মুছে ঝকঝকে তকতকে করার চেষ্টা। ছেঁড়া, তালিদেওয়া বিছানাপত্র সরিয়ে ফেললুম বাইরের ঘর থেকে। ভাঙা চেয়ার দুটো এই ফাঁকে মেরামতও করিয়ে নিলুম।

আভা অবাক। যে লোক সাত জন্মে এ সব কাজে হাত দেয় না, তার যে এত আগ্রহ! ব্যাপারটা কি! ব্যাপারটা বলতেই আভা গম্ভীর মুখে সরে গেল সামনে থেকে।

দিন চারেক আগে পেরেরা সাযেবকে নিমন্ত্রণ করলুম। উপলক্ষ্য শুনে আকর্ণ হাসলেন। ডায়েরী খুলে বললেন, দাঁড়াও সেন, তারিখ আর সময়টা লিখে রাখি। দশটা কাজের হাঙ্গামায় ভুলে না যাই।

ভুলে যে তিনি মোটেই যান নি তার প্রমাণ মিলল। বিকালে নিমন্ত্রণ, পেরেরা সায়েবের গাড়ি এসে দরজায় লাগল সাত সকালে। হন্তদন্ত হযে প্রায় বেসামাল অবস্থায বাইরে আসবার আগেই পেরেরা সায়েব নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে। ফেল্ট-হ্যাট চোখের কোণ অবধি টেনে দিয়ে হালকা গানের কলি শিস দিচ্ছেন।

কাছে যেতেই মুচকি হাসলেন, তোমার স্ত্রীকে একবার ডাকো সেন। তুমিও চল আমার সঙ্গে। সামান্য একটা উপহার কিনে দেব। বিকালে তোমার স্ত্রীর হয়তো সময় হবে না। অতিথি অভ্যাগত সব আসবেন। নাও, আর দেরি কর না, আমি গাড়িতেই অপেক্ষা করছি, চটপট চলে এস।

প্রায় হাতে পায়ে ধরে আভাকে সাজিযে গুজিয়ে বের করতে আধ ঘণ্টার ওপর লেগে গেল। আভা গাড়ির কাছ বরাবর আসতেই পেরেরা সায়েব এগিয়ে এলেন দু পা। অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লেন

সামনে। মোলায়েম গলায় বললেন, এই শুভদিনে আমার প্রীতি গ্রহণ করুন। আভার মুখে অ্যানিমিক-হাসি। নেহাৎ সৌজন্য বজায় রাখা।

পেরেরা সায়েবের নির্দেশে গাড়ি থামল এক বিলিতী জহুরীর দোকানে। আমার বাঁশবনে ডোম কানার অবস্থা। দামী সব জড়োয়া গহনা শো-কেসে। চোখ ধাঁধানো দ্যুতি। দামও তেমনি কলিজা-কাঁপানো।

বেছে বেছে পেরেরা সাযেব একটা নেকলেস পছন্দ করলেন। এগিয়ে এসে একেবারে আভার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। মিনিট দুয়েক, তারপর নেকলেসটা সযত্নে পরিয়ে দিলেন তার গলায়।

আমি সভয়ে চোখ বুজলুম। হয়তো মারাত্মক কিছু একটা করবে আভা। অঙ্গ স্পর্শের এ অপমান সে নির্বিবাদে সইবে না। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটল না। একটি ফোঁটা রক্ত নেই আভার মুখে, সমস্ত শরীর একবার দুলে উঠল হাওয়া-লাগা বাঁশপাতার মতন। খুব সাবধানে নেকলেসটা খুলে ফিরিয়ে দিল পেবেরা সাযেবের হাতে। মৃদুগলায় কেবল বলল, এটা এখন থাক আপনার কাছে। বিকালে যখন যাবেন, তখন না হয় পরিয়ে দেবেন নিজের হাতে।

পেরেরা সাযেব কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলেন। মুখে বললেন, সুন্দর মুখের অনুরোধ আমি কোনদিনই ঠেকাতে পারি না। বিকেলে অতিথিদের মধ্যে আমিই দেখবেন হয়তো আগে গিয়ে হাজির হবো।

মাঝপথে পেরেরা সাযেব নেমে পড়লেন কোন এক বন্ধুর বাড়ি। গাড়ি আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল। পথে একটি কথাও নয়। ঘোমটা কপাল বরাবর টেনে আভা এক কোণ ঘেঁষে বসে রইল চুপচাপ। দু একবার রসিকতার চেষ্টা করলুম। আভার ঔদাসীন্যের বর্মে ধাক্কা খেযে ফিরে এল রসিকতার সমস্ত প্রয়াস। বললুম, সুন্দর মুখের জয়

সর্বত্র। এমন যে রংয়ের কারবারী পেরেরা সায়েব তার মনেও রং ধরিয়ে দিল। ভালই হয়েছে, বিকেলে এক ফাঁকে সায়েবের কাছে আমার কথাটা পেড়ে ফেলব। ভৈরববাবুর জায়গায় কাজ যখন করছি, তখন তার মাইনেটা অন্তত আমার পাওয়া উচিত, কি বল? তুমিই না হয় একটু বলে দেখ আমার কথা। চোয়াল-প্রকট, রুইতন-প্যাটার্ন মুখের কথায় হয়তো ভিজবেন না পেরেরা সায়েব, তোমার চাঁদমুখে অনুরোধ ক'রে দেখ, বুঝলে?

দুর্গাপদবাবু আবার থামল। দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে, আবার বসল। মনে হ'ল বেশ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

—তারপর? চেয়ারে হেলান দিয়ে আমি খেই ধরিয়ে দিলুম। চেয়ারে আর বসল না দুর্গাপদবাবু। দুটো হাত পিছনে দিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। বলল, তারপর আর বিশেষ কিছু নেই স্যার। সারা সকাল ঘোরাঘুরি করে দুপুরের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিল, হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে লাফিয়ে উঠলুম। ছুটে পাশের ঘরে গেলুম, কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

গরম তেলের কড়া উল্টে পড়েছে সারা মুখের ওপর। আভার চীৎকারে কান পাতা দায়। তারপর দেড়মাস যে কিভাবে কেটেছে, আমি আজো ভেবেও কুলকিনারা পাই না স্যার। হাসপাতাল আর ডাক্তারখানা, জমানো টাকা সব নিঃশেষ। আশ্চর্যের কথা, পেরেরা সাযেব একদিন হাসপাতালে এসেছিলেন, আভার মুখের চেহারা দেখে, oh horrible বলে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, আর আসেন নি।

দেড়মাস পরে আভা সেরে উঠতে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, এ দুর্ঘটনা হ'ল কি ক'রে। এক কড়া তেল গরম করারই বা কি দরকার ছিল, আর সে ফুটন্ত তেল এমনভাবে সারা মুখে ছিটিয়ে পড়লই বা কি

ভাবে ? প্রথম প্রথম কোন উত্তর দিত না স্যার। শেষকালে বলত, বরাত। আমার কিন্তু স্যার, অন্য কথা মনে হয়। কি মনে হয় জানেন—

দরজায় জোর শব্দ। বাইরের দরজায় নয়, এ পাশের ভিতরের দিকে।

—ওই স্যার, আর উপায় নেই, জোর তলব পড়েছে। ভগবান জানেন, আড়ি পেতে সব শুনছিল হয়তো। এইবার নেবে আমার ওপর এক চোট।

দুর্গাপদবাবু দরজার দিকে যেতে যেতে ফিরে এল। বলল, একটা সিগারেট দিন স্যার। রাত্রে অনেকক্ষণ হয়তো ঘুমই আসবে না, শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানা যাবে। তাছাড়া, কাহিনীও আমার প্রায় শেষ। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা এই মুল্লুকে এসে উঠলুম। চাকরি না ছাড়লে পেরেরা সায়েবই হয়তো আমায় ছাড়িয়ে দিতেন একদিন। শুধু প্রাণ দিয়ে খেটে পেরেরা সায়েবের কাছে চাকরি রাখা যেত না, আর উন্নতিও হত না।

আবার দরজায় অসহিষ্ণু করাঘাতের আওয়াজ। সিগারেটটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে দুর্গাপদবাবু আরো জোরে পা চালাল, দেখুন, ডাকের ধরনটা দেখুন একবার। আমি কি বিশ মাইল দূরে রয়েছি ?

দুর্গাপদবাবু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। শুধু দুর্গাপদবাবুর কেন, আজ রাতে ঘুম হয়তো আমারও আসবে না।

নিভে এসেছে চুল্লীটা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অঙ্গারের টুকরো। একবার মনে করলুম, পা দিয়ে নাড়াচাড়া দিই একটু। ফুটে উঠুক আগুনের দীপ্তি। নীল শিখার মৃদু নর্তন শুরু হক। কিন্তু কি ভেবে আর পা বাড়াতে ইচ্ছা করল না। পুড়ে ছাই-ই হয়ে যাক সব কিছু। আগুনের সঙ্গে কতক্ষণ ওরা যুঝবে !

শিল্পাত্মী

দত্ত সায়েবের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। দিন পনেরো আগেই খবর এসেছিল, আজ সকালে টেলিগ্রামটা হাতে আসতেই দত্ত সায়েব লাফা-লাফি শুরু করলেন। বাগান থেকে এক লাফে নিচের ঘরে—সেখান থেকে একেবারে দোতলায়।

—চামেলী, চামেলী।

চামেলী দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে সবে আরাম ক'রে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, দত্ত সাহেবের চীৎকারে উঠে দাঁড়াল, বাবারে বাবা, হ'ল কি? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে নাকি?

গলার স্বর অনুসরণ ক'রে দত্ত সায়েব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। টেলিগ্রাম-ধরা হাতটা প্রসারিত ক'রে বললেন, চামেলী, খবর এসে গেছে।

চামেলী একটুও আগ্রহ দেখাল না, নিস্তেজ গলায় বলল, কিসের খবর?

—বারে, এই যে সেদিন বললাম, ভুলে গেলে এর মধ্যে?

চামেলী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। ভোরের বাতাসে কপালের ওপর এসে পড়া চুলের টুকরো হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বলল, কি বললে সেদিন?

—না, hopeless! দত্ত সায়েব পাশের আর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। টেলিগ্রামটা সামনে রেখে চেঁচিয়ে পড়লেন, MISS RUBY REACHING TOWN TUESDAY AS ARRANGED.

—মিস রুবি ! কই ও নামের তো কাউকে মনে পড়ছে না। মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হ'ল চামেলী যেন সত্যিই খুব চিন্তায় পড়েছে।

—না, তুমি ডোবালে দেখছি, দত্ত সায়েব বিব্রত হয়ে পড়লেন, আশ্চর্য, আজ ছ' মাস ধরে রুবির আসার কথাবার্তা হচ্ছে না ? কত চিঠি লেখা-লিখি হ'ল, আর বেমালুম ভুলে গেলে ?

সূর্যের আলোয় একটু একটু ক'রে জমাট কুয়াশা কেটে যাওয়ার মতন অল্প অল্প ক'রে চামেলীর মনে পড়ে গেল। আজ ছ' মাস ধরে সত্যিই চিঠিপত্র চলছে। সুদূর আফ্রিকার বনবিভাগের কর্তাদের সঙ্গে। বাচ্ছা শিম্পাঞ্জী একটা ধরা পড়লেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এতদিন পরে বুঝি সেই শিম্পাঞ্জীই ধরা পড়েছে।

চামেলী আন্দাজেই ঢিল ছুঁড়ল, মিস রুবি বুঝি তোমার সেই শিম্পাঞ্জীর নাম ?

—That's it, দত্ত সাযেব সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলেন, মাদী শিম্পাঞ্জী এরোপ্লেনে এসে পৌছোবে আজ বেলা সাড়ে এগারোটায়। কথার সঙ্গে সঙ্গে দত্ত সাযেব কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে একবার নজর দিলেন। মাত্র সাড়ে ছটা। এখনও অঢেল সময় হাতে। এর মধ্যে শিম্পাঞ্জীদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বইটা আর একবার পড়ে নিলে হয়। W. W. Riversএর লেখা Nature And Habit Cf Chimpanzees.

কথা শেষ ক'রে দত্ত সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ছোকরাকে বলো আমার চা-টা বাগানে দিতে, বুঝলে ?

দত্ত সাযেব নেমে যেতেই চামেলী নিশ্বাস ফেলল। বুক কাঁপিয়ে। আজ বলে নয়, মানুষটা চিরকালই এই রকমের। আজ পাঁচ বছরের ওপর চামেলী দেখছে। বিয়ের প্রায় পর থেকেই।

বিয়ের কনে বাড়িতে পা দিয়েই চামেলী চমকে উঠেছিল। বাড়ি না চিড়িয়াখানা। একদিকে খরগোস, গিনিপিগ আর বিলিতি ইঁদুরের খাঁচা, অন্যদিকে রং-বেরংয়ের পাখি। রাতদিন শুধু দত্ত সায়েব তদারক ক'রে বেড়ান। খাঁচা খুলে খাবার দেন আর বসে বসে খাতায় নোট করেন।

যে খায় চিনি তাকে জোগান চিন্তামণি। দত্ত সায়েবের মনের মতন কাজও জুটে গেল। রাজস্থানের এক রাণার খেয়াল চিড়িয়াখানা করবেন। বিরাট এলাকা জুড়ে জন্তু-জানোয়ারের আস্তানা। বেছে বেছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করলেন দত্ত সায়েবকে। দত্ত সায়েবের অবস্থা হাতে চাঁদ পাওয়ার সামিল। স্নান খাওয়া ঘুচে গেল, সারাটা দিন এক খাঁচা থেকে আর এক খাঁচা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রচুর বই আনালেন বিলেত থেকে। অবসর সময়ে সেই সব নিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন।

অথৈ জলে পড়ল চামেলী। বিদেশ বিভূঁই। চেনা-জানা লোকের বালাই নেই। অবশ্য বিয়ের পর বাইরের লোকের ঝামেলা যত কম হয় ততই ভাল। বাড়ির মানুষটাই সব। এই সময় অন্যদিকে চোখ ফেরাবার অবকাশই পাওয়া যায় না। ইনিয়ে বিনিয়ে কথার জাল বোনা, হাতে হাত রেখে বিনিদ্র রজনীযাপন। কিন্তু চামেলীর বরাতই আলাদা। ঘরের মানুষ ঘরেই থাকে না। দিনরাত টো টো ক'রে ঘুরছে। নতুন সিংহের বাচ্ছা এসেছে। দত্ত সায়েব নিজে ছুটছেন বাজারে। কচি মাংস নরম হাড় জোগাড় করছেন, নয়তো নতুন কি একটা পাখি এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, পোকা ছাড়া আর কিছু ঠোঁটেই তোলে না, লোক নিয়ে মাটি কোপানো হচ্ছে, পোকার আশায়। স্ট্র-হ্যাট মাথায় দিয়ে দত্ত সায়েব পর্যবেক্ষণ করছেন। পোকা তুলে তুলে আলাদা ঠোঙায় রাখছেন। প্রথম প্রথম চামেলীও ঘুরতো

দত্ত সায়েবের সঙ্গে সঙ্গে। চিতা বাঘ আর খেঁকশেয়ালীর খাঁচার আশে-পাশে। নতুন পাখি এলে ছুটে দেখতে আসত। কিন্তু মানুষের উৎফুল্ল হবারও একটা মাত্রা থাকে। দিন কতক পরেই ক্লান্তি এল চামেলীর। ক্লান্তি আর অবসাদ। নতুন নতুন শাড়ি গয়না এসব শুধু একমুঠো বন্দী পশুপক্ষীকে দেখিয়ে লাভ! তবু দুঃখ থাকত না চামেলীর যদি ঘরের মানুষটার চোখ থাকত।

কতদিন চামেলী সাজগোজ: ক'রে বসে থেকেছে দত্ত সায়েবের জন্য। দত্ত সায়েব বিকালে একবার চা খেতে আসবেন সেই আশায়। আয়নায় কতবার নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে। প্রসাধন-সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়েছে। যৌবনদৃপ্ত দেহ ঘিরে রাঙা শাড়ি।

দত্ত সায়েব চৌকাঠ পার হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চোখের সান-গ্লাসটা খুলে ফেলে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন।

চামেলী মুচকি হেসেছে। আর ভয় নেই, বাঁধা পড়েছে কুরঙ্গ রূপের রজ্জুতে, আষ্টেপৃষ্ঠে আটকেছে। ভ্রূ দুটো তুলে চামেলী বিলোল কটাক্ষে বিদ্যুতের দাহ এনে বলেছে, কি দেখছো অমন ক'রে ?

দত্ত সায়েব একটু আমতা আমতা ক'রে বলেছিলেন, মানে তোমার ওই লাল শাড়িটা দেখছি।

চামেলী আরো একটু এগিয়ে এসেছে। ফিস ফিস ক'রে বলেছে, —চমৎকার রং শাড়িটার না গো ? এটা পরে আমায় কেমন দেখাচ্ছে বলতে হবে—

—না, ঠিক তোমায় কেমন দেখাচ্ছে, সে কথা নয়, আমি আর একটা কথা ভাবছি।

—আর একটা কথা! চামেলী খাঁজ ফেলেছে কপালে। কৃত্রিম অভিমানে মুখটা গম্ভীর ক'রে তুলেছে।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা মানে, ওই যে মালয় থেকে মাস তিনেক আগে কাকাতুয়াটা এসেছিল, প্রথম যখন এলো, গায়ের রং এমনি গাঢ় লাল, অথচ আশ্চর্য দেখো, যত দিন যাচ্ছে, তত পালকের রং কেমন ফিকে হয়ে আসছে। অথচ রোগ-টোগ কিছু নয়। কেন যে এমন হচ্ছে—

মাঝপথেই দত্ত সাহেব কথা থামিয়ে ফেলেছিলেন। যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা, সে-ই যদি না শোনে তবে বলে লাভ ?

ততক্ষণে চামেলী সরে এসেছে পাশের ঘরে। জল-টলটল দুটি চোখ। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। শাড়ি-গয়না খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মেঝেয়।

কিন্তু তাতেও দত্ত সাহেবের তপস্যা ভাঙে নি। মোটা মোটা বইয়ের আড়ালে তন্ময় হয়ে গেছেন। লাল থেকে ফ্যাকাশে রং হওয়ার কারণ সম্বন্ধে গোপন তথ্য। ভিটামিনের অভাবে না জলবায়ুর পরিবর্তনে সেটা জানা একান্ত আবশ্যক।

ক্রমে ক্রমে চামেলীর সবই গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং দত্ত সাহেবের সঙ্গ আর সে কামনা করত না। চিঠি লিখে সেও এক গাদা বই আনিয়েছিল। নতুন নতুন ডিজাইনের জামা আর নতুন প্যাটার্নের সেলাই। ভাল ভাল পশম কিনে চামেলী নানান রকমের জিনিস তৈরী করায় মন দিয়েছে। কানঢাকা টুপি, মোজা, সোয়েটার। নিজেদের জন্য নয়, ডেকে ডেকে বিলিয়ে দিয়েছে মালীর ছেলেদের, মজুরদের বাচ্ছাগুলোকে।

মাঝে মাঝে রাণা সাহেব চিড়িয়াখানা দেখতে আসতেন। ঝকঝকে মোটরে চড়ে। সেদিন সারা চিড়িয়াখানায় সাড়া পড়ে যেত। সকাল থেকে ধোয়া-মোছা, খাঁচার গরাদে পালিশ লাগানো, পাখিদের দাঁড়ে নতুন রং। দরোয়ান, মালী, চাকর-বাকর সবাই মেজে-ঘষে ঝক-

ঝকে তকতকে। দত্ত সায়েবের তো মরবার সময় নেই। ভোর থেকে ছুটোছুটি। ক্রমে রাণা সায়েবের শখও কমে এল। আগে মাসে দু'বার আসতেন, আজকাল দু মাসে একবারও খোঁজ নেন না। লোকে বলে বিলেত থেকে আনকোরা মেম আমদানী করেছেন, নজর এখন সেদিকে।

রাণা সাযেব গা ঢিলে দিলে কি হবে, দত্ত সায়েবের উৎসাহ অফুরন্ত। নানা দেশে চিঠিপত্র লিখে আজব সব জন্তুদের খোঁজ-খবর, ম্যাগাজিনের পাতা থেকে নতুন তথ্য-সংগ্রহ। কোন প্রবালদ্বীপে নিশাচর রঙ্গীন পাখির আস্তানা, বাণা সাযেবকে ধবাধবি ক'বে সেই পাখি একজোড়া আনার চেষ্টা, হিমালযের তরাই অঞ্চলে কৃষ্ণচক্ষু মৃগসার দেখা গেছে, সেখানকার শিকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ।

দু' একবাব ঠকতেও হয়েছে দত্ত সাযেবকে। নতুন ধবনের পাখি পাঠাবো বলে, আগাম টাকা নিয়ে স্রেফ একজোড়া কালপেঁচা পাঠিযে দিয়েছে আমেদাবাদের এক ভদ্রলোক। লাল ইঁদুব বলে আলতা মাখানো ইঁদুর পার্সেল করেছে বীরভূমের একদল বদমাইস।

কিন্তু এবারে একেবারে আসল জিনিস। আফ্রিকাব বনবিভাগের ছাপমারা চিঠি। শুধু তাই নয, শিম্পাঞ্জীব সঙ্গে এক ট্রেনাবও আসছে। কাফ্রি ছোকরা। কিছুদিন থেকে সে ফিরে যাবে।

রাণা সায়েব নিজে যাবেন না কিন্তু মোটব পাঠিয়ে দিয়েছেন। দত্ত সাযেবের যাতে অসুবিধা না হয়। শিম্পাঞ্জী এসে বসলে, তিনি দেখতে আসবেন দলবল নিযে।

দত্ত সায়েব ফিরলেন বেলা একটা। প্লেন একটু লেট ছিল, তাছাড়া কাস্টমসএর হাঙ্গামা, মোটরে ওই বিরাট খাঁচা আনাই দুষ্কর। তার ওপব সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল পথের দু পাশে।

শিম্পাঞ্জী যখন চিড়িয়াখানায় ঢুকল, তখন চামেলী বারান্দায়। দেরি দেখে ছুটোছুটি করছিল। সেই কখন একটু চা মুখে দিয়ে লোকটা বেরিয়েছে, খিধে-তেষ্টাও কি পায় না। বেলা দুপুর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও ফেরার নাম নেই।

ফিরেও অবশ্য দত্ত সায়েব বাংলোয় গেলেন না। একেবারে কোণের দিকে যেখানে গাছপালার জটলা সেখানে রাখা হ'ল খাঁচাটা। ট্রেনারের তাই মত। ঘন গাছে ঢাকা আরণ্যভূমিতে বেড়াত, এখানে এসে তার কিছুটা যেন স্বাদ পায় তাই এই বন্দোবস্ত। বড় বড় মর্তমান কলা আনা হ'ল বাজার ঢুঁড়ে। তিনদিন চিড়িয়াখানা বন্ধ রইল। বাইরের লোক যাতে এসে উৎপাত না করে সেইজন্য। দত্ত সায়েব বাংলোয় ফিরলেন বেলা তিনটে, সঙ্গে কাফ্রি ট্রেনার জন। চার ফুট উঁচু জমাট অন্ধকার। ঝক-ঝকে সাদা দাঁতের সার। খোঁচা খোঁচা চুল। গায়ে রং-বেরংয়ের শার্ট। ইংরাজী ভালই বলে।

খাবার টেবিলে চামেলীকেও বসতে হ'ল। আলাপ করতে হ'ল ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে। কিন্তু আলাপ বেশিক্ষণ জমল না। ওদের খাওয়া শেষ হবার আগেই খাওয়া শেষ ক'রে মাথাধরার ছুতোয় চামেলী উঠে গেল। দত্ত সাহেবের খেয়াল নেই। তিনি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনছেন শিম্পাঞ্জীর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, রোগের বিবরণ, আরোগ্যের হদিশ। শুধু শোনা নয়, দত্ত সায়েব সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পেনসিলে নোটও করে নিলেন। Riversএর বই একটা আছে এ বিষয়ে, কিন্তু তবু জনের অভিজ্ঞতার দাম আরো বেশি। আফ্রিকার আরণ্যভূমিতে জন্ম, আশৈশব মানুষ হয়েছে বন্য জন্তুদের পাশাপাশি, জীবনে একবার গরিলাও দেখেছে, একেবারে সামনাসামনি। তাছাড়া এর আগে আরো দুটো শিম্পাঞ্জী চালান দিয়েছে দু' জায়গায়। শিম্পাঞ্জীদের ধরন-ধারণএর খুব জানা।

কটা দিনের ব্যাপার—তাই জনের থাকার বন্দোবস্ত বাংলোর একতলার ঘরেই হয়েছে। দত্ত সায়েবের বেশির ভাগ সময় কাটে হয় জনের সঙ্গে, নয়তো শিম্পাঞ্জীর খাঁচার আশে-পাশে। একটু একটু ক'রে ধাতস্থ হচ্ছে শিম্পাঞ্জী। জনই এর নাম দিয়েছিল রুবি। গলায় একটা লাল পুঁথির মালাও আটকে দিয়েছে। প্রথম প্রথম রুবি চুপ-চাপ শুয়ে থাকত মেঝের ওপর। খাবার-দাবার ছুঁতো না। জন অনেক ডাকাডাকি করলে মুখটা একবার তুলেই আবার নিচু ক'রে ফেলত। এখন খাঁচার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মাঝে মাঝে গলার আওয়াজও শোনা যায়। জনের মতন দত্ত সায়েবকেও চিনে ফেলেছে। দূর থেকে আসতে দেখলে একটানা চেঁচানি শুরু করে।

চামেলীর প্রাণ অতিষ্ঠ। যতটুকু মানুষটা ঘরে থাকে কেবল বই আর বই। আরো নতুন নতুন বই আনিয়েছে সাগরপার থেকে। শুধু পড়া নয়, আলাদা একটা কাগজে দত্ত সায়েব নোট করতেও শুরু করেছেন।

সেদিন সারাটা সকাল আর দুপুর চামেলী ছটফট করল। দু' একজনের সঙ্গে আলাপ অবশ্য হয়েছে। আগের দিকে দত্ত সায়েবের সঙ্গে গিয়েওছে তাদের বাড়ি। তাদের আসতে বলেছে, কিন্তু তারা আসে নি। বলে পাঠিয়েছে চিড়িয়াখানা যাওয়ার ভীষণ ঝামেলা। গেটে আটকায়। মাথা পিছু পয়সা দিতে হয়, নয়তো দত্ত সায়েবের নাম করলে লোক যায় ভেতরে, খুঁজে খুঁজে দত্ত সায়েবকে বের করে। তাঁর হাতের লেখা শ্লিপ এলে তবে পাওয়া যায় ছাড়পত্র। বড্ড তকলিফ। লোকের বাড়ি যেতে এত মেহনৎ পোষায় না। কাজেই চামেলীরও আর তাদের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না। কাঁহাতক আর একতরফা যাওয়া চলে?

বিকেল হ'তে চামেলী লনে নেমে এল। জন কাল রওনা হয়ে গিয়েছে। দত্ত সায়েব এখন একলা। কাজেই দেখা পাওয়া হয়তো খুব দুষ্কর হবে না। দেবদারু গাছের নিচে দত্ত সায়েবের সাক্ষাৎ মিলল। একটা চেয়ারে বসে আছেন। মন ডুবুরী হয়েছে বইয়ের পাতায়।

চামেলী একটু এগিয়ে কাঁধে হাত রাখতেই দত্ত সায়েবের চমক ভাঙল। মুখ তুলে বললেন, আরে এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমার কি ভাগ্যি!

ততক্ষণে দত্ত সায়েব দাঁড়িয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, বুধ সিং, চেয়ার, চেযার একটা।

চেয়ার আসতে চামেলী বসল। হারানো কথার খেই ধরল, আমার কথা কি ভাবছিলে বল?

—তোমার কথা মানে, তোমাকে খুঁজছিলাম।

—হঠাৎ?

—একটা বই পড়তে পড়তে ভারি সুন্দর কতকগুলো কথা পেলাম। খাঁটি সত্যি কথা। জানো, লিখেছে, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং, এরা ঠিক বাঁদর নয়, বারো আনা ধরন-ধারণ এদের মানুষের মতন, বাকি চার আনায় হয়তো বাঁদরের আমেজ। এরা আমাদের মতন চিন্তা করে, শোকের অনুভূতি আর প্রকাশ অবিকল আমাদের মতন।

—তুমি একটু বস, আমি আসছি। চেয়ার থেকে চামেলী উঠে পড়ল। পায়ের ধাক্কায় বেতের চেয়ার উল্টে পড়ল লনের ওপর। ফিরেও চাইল না একবার। হন্ হন্ করে গেটের বাইরে চলে গেল। সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। খোলা মাঠে একলাই বেড়িয়ে আসবে। জন্তু-জানোয়ার, পাখ-পাখালী ঘিরে লোকটা বসে থাকে। তাদের দুঃখকষ্ট ব্যথা-বেদনায় অংশীদার হয়ে।

খোলা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই হু হু ক'রে চোখের কূল ছাপিয়ে জল। মোছবার কোন চেষ্টা করল না চামেলী। বুকের নিরুদ্ধ বেদনা অশ্রুর রূপ নিয়েছে। চোখের জল মুছলেই বুকের ব্যথা কমবে না।

দিন কয়েকের মধ্যে বাইরে বেরোবার এক সুযোগ মিলল। রায় বাহাদুর রণজিত লোডার বিরাট বাগানবাড়ি এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। গোটা ছয়েক গাড়িরও যোগাড় হয়েছে। মিষ্টার আর মিসেস দত্তরও নিমন্ত্রণ। বনভোজনেব। কথা হ'ল সকাল আটটার মধ্যে সবাই তৈরী থাকবে, যাবার মুখে চিড়িয়াখানার গেটে মোটর আসবে।

ভোর ভোর চামেলী উঠল। দত্ত সাযেবকেও ওঠাল। সাজগোজ শেষ ক'রে বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল। গেটের কাছে ছোকরা চাকরকে পাঠানো হ'ল। গাড়ি এসে পৌছোলেই যেন খবব দেয়।

আটটার মুখেই খবর এল। ছোকরা চাকর নয, এসে দাঁড'ল বুধ সিং।

—কি খবব? দত্ত সায়েব উঠে দাঁড়ালেন।

—বাচ্ছা কুমিরটার অবস্থা খুব খারাপ।

—খুব খারাপ? সে কি?

—ভোর থেকে চিৎ হ'যে পড়ে আছে। খোঁচা দিলেও নড়ছে না।

দত্ত সায়েব আব এক মিনিটও অপেক্ষা কবলেন না। বুধ সিংযের পিছন পিছন নেমে এলেন।

বারান্দার ওপর থেকেই চামেলী চেঁচিয়ে বলল, এখনি যে গাড়ি আসবে।

দত্ত সায়েব পিছন ফিরে চাইলেন না। যেতে যেতেই উত্তর দিলেন, আমার বোধ হয় যাওয়া হবে না। গাড়ি এলে তুমি চলে যেও।

একবার চামেলী মনে করল, সাজপোশাক সব খুলে চুপচাপ শুয়ে থাকবে বিছানায়। মাথাধরার ছল ক'রে বনভোজনে যাবে না। কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল, কাজটা ভাল হবে না। দুজনের কেউ যাবে না। সব মিলিয়ে বড় দৃষ্টিকটু ঠেকবে। কিন্তু এভাবে স্বামীকে ছেড়ে একলা গিয়েই বা লাভ কি? চুপচাপ বসে থাকতে হবে। মনের মানুষ পাশে থাকলে যতটা আনন্দ, একলা গিয়ে তার অর্ধেকও নয়। চামেলী মনে মনে আশা করল, মোটরের আসার খবরের আগেই হয় তো দত্ত সায়েব ফিরে আসবেন। তার মধ্যেই কুমির-শাবকের এসপার কিংবা ওসপার হ'য়ে যাবে।

কিন্তু বৃথা আশা। ছোকরা চাকরের সঙ্গে মিসেস লোডাও এসে দাঁড়ালেন। অথচ দত্ত সায়েবের দেখা নেই। তবু চামেলী একবার শেষ চেষ্টা করল। চাকরটাকে পাঠাল দত্ত সায়েবের খোঁজে। যদি সম্ভব হয় তবে একেবারে যেন সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসে।

চাকর ফিরে এল। সাহেব এখন খুব ব্যস্ত। কাচের নলের মধ্যে করে কুমিরকে ওযুধ খাওয়ানো হচ্ছে। এখন আসতে পারবেন না। অগত্যা চামেলী মিসেস লোডার সঙ্গে একলাই বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকেই চামেলী দত্ত সায়েবকে এড়িয়ে যেতে লাগল। দু একটা কথাবার্তা। পাশ কাটানো উত্তর। ব্যস্, তার বেশি নয়। গায়ে পড়ে আলাপ করে লাভ! যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ--এ দুটোর কোনটাই চামেলীর কুষ্টিতে লেখে নি। পাছে চোখের জল ধরা পড়ে তাই ছল-ছুতো ক'রে দত্ত সায়েবের সামনেই আসত না চামেলী।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপই নেই দত্ত সায়েবের। বাড়ির বৌ যে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সেদিকে খেয়ালই নেই। নিজের কাজেই তিনি মত্ত। খরগোস-

গুলোর গায়ে ঘা হ'তে শুরু করেছে, অস্ট্রেলিয়ান ক্যানারীটার পালক ঝ'রে যাচ্ছে, সেই চিন্তায় তাঁর প্রায় স্নান-খাওয়া বন্ধ।

এর মধ্যে আবার একদল আমেরিকান ভ্রাম্যমান দল এসেছিল চিড়িয়াখানা দেখতে। তারা দত্ত সায়েবের খুব সুখ্যাতি ক'রে গেছে। এমন সুদক্ষ লোক তারা দেখেই নি। জন্তু-জানোয়ারদের ওপর এমন দরদী দৃষ্টিভঙ্গী বিরল। দত্ত সায়েবের বুক ফুলে দশহাত। একে মনসা, তায় আবার ধুনোর গন্ধ।

কথাটা দত্ত সায়েব সবিস্তারে চামেলীকে বলতে এসেছিলেন কিন্তু সুবিধা হয় নি। চামেলী কোন কথা না বলে উঠে গেছে আস্তে আস্তে। রান্নাঘরে ঢুকে বাবুর্চির পাশে দাঁড়িয়ে রান্নার তদারক করেছে। দত্ত সায়েবের একটি কথাও কানে তোলে নি।

মুহূর্তের জন্য দত্ত সাযেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ব্যাপার কি, কি হ'ল চামেলীর! এমন মনমরা ভাব, সাত ডাকে কথা বলে না। চোখোচোখি হ'লেই চোখ নামিযে সরে যায সামনে থেকে। শরীর খারাপ? সে কথা মুখ ফুটে বললেও তো পারে! কর্ণেল চোপরা রযেছেন শহরে। বন্ধু লোক। কাকের মুখে খবর পেলেই ছুটে আসবেন।

চামেলীকে একদিন জিজ্ঞাসা করবেন ভাল করে, কাছে বসিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, কিন্তু কথাটা দত্ত সাযেব বেমালুম ভুলে গেলেন। অবশ্য তাঁর দোষও নেই। এত মেহনত ক'রে, রাণা সায়েবের এত পযসা খরচ ক'রে শিম্পাঞ্জী একটা জোগাড় হ'ল, কিন্তু দিন কযেক হ'ল কি যে হযেছে রুবির। ভাল ক'রে খায় না, বেড়ায় না উঠে হেঁটে। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে চুপচাপ পড়ে থাকে।

এই শিম্পাঞ্জীকে দেখবার জন্যই চিড়িয়াখানায় এত ভিড়। দেশ-

দেশান্তর থেকে লোক এসে জড়ো হয়, উটের পিঠে চড়ে দেহাত থেকে দলে দলে দর্শক আসে। ভিড় হলে দত্ত সায়েব নিজে ঘোরাফেরা করেন খাঁচার পাশে। কেউ যেন বিরক্ত না করে রুবিকে, বাজে জিনিস খেতে না দেয়। কিন্তু এত সাবধান হয়েও রুবির একি অবস্থা!

রাণা সায়েবের অনুমতি নিয়ে অন্য শহর থেকে পশু-চিকিৎসক এলো। নামকরা লোক। ঝাড়ফুঁক নয়, রীতিমত পাশ করা ডাক্তার। অনেকক্ষণ ধরে রুবিকে দেখল। বুকে নল বসিয়ে, চোখের কোণ টেনে, হাঁ করিয়ে দাঁত নিরীক্ষণ ক'রে। কিন্তু রোগ ধরা পড়ল না।

—কই, কি যে রোগ তা তো বুঝতে পারছি না!

—তবে?

—বোধ হয় দেশের কথা মনে পড়ছে। আফ্রিকার কথা।

—দেশের কথা মনে পড়ছে! এতদিন পরে? এদেশে দশমাস কাটাবার পর?

কথাটা দত্ত সায়েবের মনে লাগল না। ডাক্তার-বদ্যি দিয়ে হবে না। নিজেই পর্যবেক্ষণ করবেন। দূর থেকে লক্ষ্য রাখবেন রুবির ওপর। হাবভাব, আচার-আচরণ সব নজরে রাখবেন।

সেই সঙ্গে গোটা দুই বইও ওল্টাতে লাগলেন। যদি কিছু হদিশ মেলে রোগের।

রুবির এক ভাব। হয় মেঝেয় মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে, নয়তো খাঁচার তার ধরে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ঠিক যেন মানুষের মতন। অনেক দূরে কোথাও মন উধাও।

সেদিন লক্ষণ মিলিয়ে বইটা পড়তে পড়তে দত্ত সায়েব লাফিয়ে উঠে বসলেন। Eureka, আর ভয় নেই। ধরা পড়েছে রোগ। মোটেই দেহের রোগ নয়, রোগ মনের। তাই পশু-চিকিৎসক কিছু

ধরতে পারে নি। স্পষ্ট ক'রে লেখা রয়েছে—এরিক মার্শালের বইতে। সঙ্গীর অভাবে স্ত্রী শিম্পাঞ্জীর এমনি ভাব হয়ে থাকে। চুপচাপ মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা কিংবা আকাশের দিকে উদাস চাউনী। খাদ্যে অরুচি, কোনরকম আমোদে নিস্পৃহভাব। অবিকল মিলে যাচ্ছে রুবির সঙ্গে। কোন তফাত নেই।

এ রোগের একমাত্র ওষুধ আর একটি পুরুষ শিম্পাঞ্জী জোগাড় করা। আর অসুবিধা নেই। জনের ঠিকানা রয়েছে। তাকে লিখলেই হবে। যেমন ক'রেই হোক, ঠিক জোগাড় ক'রে পাঠাবে। কেবল রাণা সায়েবের মত নিতে হবে, মত আর কিছু টাকা।

অনেকদিন পরে দত্ত সায়েব স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নিজেকে যেন অনেকটা হালকা মনে হ'ল। দেহে আর মনেও। ঠিক আছে। অনেক দিন চামেলীর সঙ্গে বসে চা খাওয়া হয় নি। মুখোমুখি বারান্দায় বসে।

সারাটা রাস্তা দত্ত সায়েব শিস্ দিতে দিতে এলেন। সিঁড়ির কাছ বরাবর এসেই থেমে গেলেন। পা টিপে টিপে উঠতে লাগলেন ওপরে। চামেলীকে চমকে দেওয়ার মতলব।

বারান্দায় চামেলী নেই। এদিকের ঘরেও নয়। শোবার ঘরে পা দিয়েই দত্ত সায়েব অবাক। জানলার গরাদে মাথা রেখে চামেলী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে। চুলের রাশ ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। আলুথালু বেশ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দত্ত সায়েব দেখলেন। অবিকল এক পোজ। রুবির সঙ্গে কোন তফাত নেই। তবে এও তো মনের রোগ, দেহের কিছু নয়। মনের রোগ! কথাটা মনে হতেই এরিক মার্শালের বইটার কথা দত্ত সায়েবের আবার মনে পড়ে গেল। সঙ্গীর অভাব।

পুরুষ সঙ্গীর। সত্যিই তো তাই। বিয়ের পর থেকে দত্ত সায়েব চামেলীকে কতটুকু সঙ্গ আর দিতে পেরেছেন! জন্তু-জানোয়ার পাখ-পাখালী নিয়ে ব্যস্ত থেকে, সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন তাকে। তার জীবনকে উপেক্ষা করেছেন। ছি, ছি, নিজের ওপর ঘৃণা হ'ল দত্ত সায়েবের।

এগিয়ে গেলেন চামেলীর পিছনে। দু-হাতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে ডাকলেন, অনেক দিনের সোহাগভরা পুরনো নাম ধরে,—মিলি!

চামেলী একবার শিউরে উঠেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ লুকোলো দত্ত সায়েবের বুকে। সমস্ত শরীর কাঁপছে থর থর ক'রে। এতদিনের স'রে যাওয়া মানুষটা দু কথার এমন একটা ডাকে এমনি করে কাছে টেনে নিতে পারে!

রাঙামামী

দেখা হ'লেই রাঙামামী অনুযোগ করতেন, কই রে কি হ'ল ?

বলতাম, এই যে রাঙামামী দুটো বই আরম্ভ করেছি, এগুলো শেষ হ'লেই তোমারটা ধরব।

—আর তুই আমারটা ধরেছিস। কবে মরে যাব। রাঙামামী আপসোস করতেন।

—হ্যাঁ, মরে যাবে বই কি। কিই বা তোমার বয়স!

—মরে যাবার আবার বয়স আছে নাকি, হ্যাঁরে পাগলা ? রাঙামামী হেসে ফেলতেন, তারপর গম্ভীর হ'য়ে বলতেন, বয়স আমার কমই বা কি হল ? গেল বোশেখে আটচল্লিশ পেরিয়েছি।

বয়সের কথায় রাঙামামীর দিকে চাইতে হ'ত। আঁটসাঁট গড়ন, টুকটুকে রং, এখনও একমাথা কালো চুলের রাশ। কানের পাশে দু একটা রুপোলী ঝিলিক। তাও চট করে নজরে পড়ে না। অনেক খুঁজতে হয়।

—হ্যাঁ, তোমার বয়স আটচল্লিশ না ছাই! আমি ঘাড় নাড়তাম।

—তবে কত বল না ? একুশ না বাইশ ? কিরে পালাচ্ছিস্ যে ?

রাঙামামীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই, কেবল গাঁ সুবাদে মামী। বহু বছর আমরা পাশাপাশি ছিলাম। দু বাড়ির মাঝখানে পাতলা কঞ্চির বেড়া, সে বেড়া কাউকে আটকাতে পারে নি, এ বাড়ির লোককেও নয়, ও বাড়ির লোককেও না। আমার বেশির ভাগ সময় কাটত রাঙামামীর

কাছে। আকর্ষণ শুধু রাঙামামীই নয়, সেই সঙ্গে ছিল পাকা চালতা কুলের আচার আর বেলের মোরব্বার ওপর লোভ।

গায়ের বর্ণ অবশ্য রাঙা, কিন্তু কি সুবাদে মামী হ'লেন তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। মামাকে বড় জোর দেখেছি বার দশেক, কোন সময়েই সহজ অবস্থায় নয়। চুল এলোমেলো, দু চোখ জবাফুলের চেয়েও লাল, পা দুটো সর্বদাই টলছে। বাইরে চাকরি করতেন, শনিবার শনিবার বাড়ি ফিরতেন। তাও সব শনিবার নয়, বেশ কয়েক শনিবার এ মুখোই হতেন না।

শনিবার হ'লেই রাঙামামীর চেহারা বদলে যেত। অন্যদিন পরনে আধ ময়লা শাড়ি, এলো চুলের গোছা লুটিয়ে পড়ছে ঘাড়ের ওপর। সেমিজের বালাই নেই। ঘরদোরের শ্রীও তথৈবচ। তর-কারির ডালাটা টেবিলের ওপর, বোধ হয় বিছানার ওপর চুল বাঁধতে বসার চেষ্টা করেছিলেন, সরঞ্জাম সেখানেই ছড়ানো। ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল। ধুলোর ছিটে এখানে ওখানে। শনিবার হ'লেই কিন্তু অন্য ব্যাপার। ঝকঝকে তকতকে ঘরের মেঝে, কুটো পড়লে তুলে নেওয়া যায়। ফরশা চাদর বিছানার ওপর। বাড়তি বালিশ। সেই বালিশের ওয়াড়ে প্রজাপতি আঁকা। রাঙামামীর হাতের কাজ।

শুধু ঘরের চেহারাই নয়, নিজের চেহারাও বেমালুম পাল্টে ফেলতেন। রোদ থাকতে পালেদের পুকুরে নামতেন গা ধুতে। হাতে সাবানের বাক্স। এক ঘণ্টা ধরে গা রগড়ান। তারপর মার কাছে এসে দাঁড়াতেন চুল বাঁধবার জন্য। হাতে একরাশ চুলের কাঁটা আর ফিতা।

চুল বাঁধা শেষ করে ফরশা শাড়ি পরে রাঙামামী যখন দাওয়ায় ঘোরা-ফেরা করতেন, তখন দেখাতো ঠিক দেবী প্রতিমার মতন। আয়ত দুটি

চোখ, টিকোলো নাক, পাতলা লালচে ঠোঁট, নিটোল গড়ন হাত পায়ের। জানলা দিয়ে বসে বসে দেখতাম। শনিবার রাঙামামীর বাড়ি যেতাম না। যাওয়া অবশ্য বারণ ছিল না, কিন্তু সেদিন গেলে বিশেষ সুবিধা হ'ত না। রাঙামামী কেমন আনমনা, দশটা কথা জিজ্ঞাসা করলে তবে একটা উত্তর, নিজে থেকে একটি কথাও নয়। তা ছাড়া, চালতা, কুল, বেলের মোরব্বা উধাও।

মাঝে মাঝে শনিবারেও ডাক পড়ত। সন্ধ্যা উতরে গেলে রাঙামামী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আমাদের বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকতেন, টুনু আছিস, অ টুনু!

আমি এই ডাকের প্রতীক্ষায় জানলার ধারে বসে থাকতাম। সামনে বইয়ের পাতা খোলা থাকত কিন্তু মন কঞ্চির বেড়া পার হ'য়ে রাঙামামীর কাছাকাছি।

এক ডাকেই কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

—কটা বেজেছে বলতে পারিস টুনু?

আসবার আগে দেয়ালে টাঙানো বাবার হাত-ঘড়িটার ওপর নজর বুলিয়ে এসেছিলাম, বললাম, সাতটা প্রায় বাজে।

সাতটা! রাঙামামীর মুখে অবসাদের আভাস, গলার স্বরে হতাশার রেশ, আস্তে আস্তে বলতেন, সাতটা! তার মানে ছটা বাইশের গাড়ি এসে গেছে।

—কখন! ভাল হ'য়ে বসি রাঙামামীর পাশে।

অনেকক্ষণ পরে রাঙামামীর গলা, এর পরের গাড়ি কটায় রে টুনু?

—আটটা বারো।

—আটটা বারো! তার মানে আপদটা আজ আর এল না। কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস।

প্রথম প্রথম বুঝতে অসুবিধা হ'ত। আপদ! আপদ আবার কে? পরে বুঝতে পেরেছিলাম। আপদ মামা। কোন দিন রাঙামামীর মুখে আর কোন ডাক শুনি নি।

রাঙামামী উঠে পড়তেন। একটা একটা ক'রে মাথার কাঁটা খুলে ফেলতেন। ভেঙে ফেলতেন খোঁপা। ফরশা কাপড় ছেড়ে আবার আধময়লা শাড়ি জড়াতেন। দাওযার খুঁটিতে হেলান দিযে বসে থাকতেন চুপচাপ। কোলের ওপর দুটো হাত জড়ো করে।

আমিও বসে থাকতাম। কথা নয় বার্তা নয়, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম রাঙামামীর মুখের দিকে। নারকোল গাছের ছাযার কিছুটা রাঙামামীর মুখে। স্পষ্ট কিছু দেখা যেত না কিন্তু আভাসে বুঝতাম দু গাল বেযে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। আঁচল দিয়ে চোখ মোছার কোন চেষ্টা নয়, কান্না থামাবার কোন প্রয়াস নয়। মাঝে মাঝে ঠোঁটদুটো শুধু কেঁপে কেঁপে উঠত।

অনেকক্ষণ রাঙামামী বসে থাকতেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগেও জানলা দিযে চেযে দেখতাম রাঙামামী একভাবে বসে। খাওয়া-দাওয়া নয়, নড়াচড়া নয়।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, রাঙামামী অমন করে বসে কেন মা?

মা নিচু হ'যে জানলা দিযে দেখতেন। বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলতেন, আহা বেচারী!

—কি হযেছে মা?

মা আর কোন কথা বলতেন না। রান্নাঘরে খেতে বসে ফিসফাস ক'রে বাবাকে কি সব বলতেন। মাঝে মাঝে রাঙামামীর নামটা কানে আসত।

যে শনিবার মামা বাড়ি ফিরতেন, সেদিন রাঙামামী আনন্দে ডগমগ। আমার কথা আর মনেই থাকত না। মামাকে গাড়ু গামছা এগিয়ে দেওয়া, মাঝে মাঝে নিজের হাতে পা মুছিয়ে দেওয়া, পরিপাটি করে আসন পেতে মামাকে কাছে বসে খাওযানো। মামার গলার আওয়াজ বেশি পাওয়া যেত না, দু একবার জড়ানো গলায় চীৎকার কিংবা বমির শব্দ। ব্যস।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপাবও হ'ত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসতাম বিছানায়। গুন গুন করে গানের শব্দ। সে বয়সে তাল মান সুর বোঝবাব কথা নয়, কিন্তু মিষ্টি একটা সুরের প্রবাহ আচ্ছন্ন করে ফেলত আমায়। মনে হ'ত এমন গান আমি কোনদিন শুনি নি। রাঙামামীর ওপর রাগ হ'ত। এমন চমৎকার গলা অথচ কোন দিন একটা গানেব কলিও কি শোনাতে নেই আমাকে! এ গান কি এমনি ক'রে দরজা জানলা বন্ধ করে গাইতে হয়? কেবল যাতে মামা শুনতে পায়, আর কেউ নয়।

সোমবার সকালে মামা চলে যেতে আমি বাঙামামীব কাছে গিযে দাঁড়াতাম। অভিমান ভরা গলায বলতাম, যাও আব কোনদিন যদি কথা বলি তোমাব সঙ্গে?

তরকারি কুটতে কুটতে থেমে বঁটিটা কাত কবে বেখে বাঙামামী হাসতে হাসতে বললেন, কেন গো টুনুবাবু, কি অপরাধ করলাম আমি?

—হুঁ, কেবল লুকিয়ে লুকিযে মামাকে গান শোনাবে দরজা জানলা বন্ধ কবে। আমরা যেন আব গান শুনতে পাবি না, না?

হাসতে গিয়েও মামী গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। সারা মুখে বেদনাব মেঘের সঞ্চার। দুটি চোখ অশ্রুম্লান। খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায বলতেন,—আমি গান গেযেছি কে তোকে বললে?

প্রতিবাদের ধরন দেখে চটে উঠতাম, আমি নিজের কানে শুনেছি মশাই। বিছানার ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।

—দূর ভুল শুনেছিস। কোন পেত্নীর গলা। নিজের মানুষকে ধরে রাখবার জন্য বোধ হয় ইনিয়ে বিনিয়ে সুর তুলছিল।

খুব চটে গরম, কিছু বলতে গিয়েই থেমে যেতাম। রাঙামামীর দুটি চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। গাল ভিজিয়ে, বুকের আঁচল ভিজিয়ে।

একটি কথাও বলতে পারতাম না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে বাড়িতে পালিয়ে আসতাম।

আসল ব্যাপার বুঝলাম অনেক পরে। স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ছি তখন। মামার আসা-যাওয়ার পালা তেমনি চলছে, রাঙামামীর প্রতীক্ষা করার ধরনও এক।

মাঝরাতে রাঙামামীর গান নয়, আচমকা চীৎকার।

দরজা খুলে ছুটে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিছন পিছন মাও এসেছিলেন কিন্তু তিনি কি ভেবে বেড়ার এপারেই রয়ে গেলেন। রাঙামামী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কপাল চেপে। হাতের ফাঁক দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত।

আর একটু এগোতেই রাঙামামী দেখতে পেলেন। হাত নেড়ে বারণ করলেন। আমি পায়ে পায়ে পিছিয়ে এলাম। দাওয়া থেকে নেমে পথের ওপর, সেখান থেকে সরে সরে আমাদের বাড়ির উঠানে।

চলে আসতে আসতেই মামার কর্কশ কণ্ঠ কানে গেল, বেশ করব খাব। আলবৎ খাব। কারুর বাপের পয়সায় খাচ্ছি? আমাকে বাধা দিতে এলে খুন করে ফেলব। হুঁ।

মামা প্রকৃতিস্থ নন, এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম আর রাঙামামীর কপাল থেকে ঝরে পড়া রক্তবিন্দুর ইতিহাসও অজানা ছিল না।

আরো বছর তিনেক। ম্যাট্রিক পাশ করে শহরে চলে এলাম। তার আগেই লক্ষ্য করেছি মামার আসাও খুব কমে গিয়েছে। মাসে একবারও আসেন কিনা সন্দেহ। এলেও রাঙামামীর গান আর নয়, সারা রাত ধরে খিটিমিটি, বচসা। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ছিটকে ছিটকে বাইরে আসত।

সপ্তাহান্তে বাড়ি আসতাম। একদিন সবে দাওয়ায় পা দিয়েছি, দেখলাম রাঙামামী মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ আমাকে দেখতে পান নি।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ মা, রাঙামামী না? মা বললেন, হ্যাঁ রে। আহা বেচারীর যা অবস্থা! লোকের বাড়িতে চালডাল ধার করে বেড়াচ্ছে।

—কেন, মামা?

—হুঁ, মা তালুতে জিভ ঠেকিযে হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করলেন, এ তল্লাটে আর আসে না। আজ মাসখানেক তার পাত্তা নেই। গোটা চারেক চিঠি লিখেছে কোন উত্তর আসে নি।

আর কথা বাড়ালাম না। বড় হযেছি, যখন তখন রাঙামামীর বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সময়ও পাই না। শনি রবি দুটো দিন এদিক ওদিক করেই কেটে যায়। এ ছাড়াও বুঝতে পেরেছি ভাগ্য বিড়ম্বিতা রাঙামামীর অন্তরের কাহিনী। মদ্যপ স্বামীকে নিয়ে জীবন-নির্বাহ করার জ্বালা।

সেদিন বাইরে বেরোবার মুখেই বাধা পেলাম। রাঙামামী উঠান থেকে নাম ধরে ডাকলেন, টুনুবাবুর যে দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল?

থেমে মুচকি হাসলাম।

রাঙামামী কয়েক পা এগিয়ে এলেন, শোন একটা কথা আছে।

পাড়ার লাইব্রেরিতে যাবার একটু দরকার ছিল, কিন্তু রাঙামামীর ডাক উপেক্ষা করা যায় না।

দাওয়ার কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে বললাম, কেমন আছেন ?

রাঙামামী হাসলেন, তবু ভাল, আজকাল তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। কখন আস, কখন যাও কিছুই টের পাই না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাঙামামী চালের বাতা থেকে একটা আসন টেনে নিয়ে দাওয়ার ওপর পেতে দিলেন।

—এ আবার কি ?

—বাবা, তুমি আজকাল কলেজে পড়ছো, আসন না পেতে তোমায় বসতে বলতে পারি ? আর তো ছোটটি নেই যে আচার আর মোরব্বার জালে তোমায় আটকাব।

সহজ সুরে রাঙামামী কথাগুলো বলার চেষ্টা করলেও গলার আওয়াজ যেন ভেজা ভেজা। চোখের কোণেও অশ্রুর ইশারা।

—কিছু বলবেন রাঙামামী ?

রাঙামামী কোন উত্তর দিলেন না। কাছে বসে পড়লেন। গলাটা এগিয়ে নিয়ে এসে প্রায় কানে কানে বলার মতন বললেন, আমার একটা কাজ করে দিবি টুনু ?

চোখ তুলে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলাম। উদ্বেগ আর অনুনয়ের মিশেল দু চোখের দৃষ্টিতে।

খুব আস্তে বললাম, বলুন ?

রাঙামামী আরো কাছে সরে এলেন। প্রায় গা ঘেঁষে, বললেন, হ্যারে তোর তো কলকাতায় অনেকদিন হ'যে গেল। রাস্তাঘাট সব চিনিস ?

সমস্ত রাস্তাঘাট চেনা অবশ্য সম্ভব নয়, কলকাতায় বহু বছর বাস করলেও। কিন্তু এমন কথা কারুর কাছে স্বীকার করা যায় না, অন্ততঃ রাঙামামীর কাছে তো নয়ই।

বললাম, তা চিনি বই কি! প্রায় সবই চিনি।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। স্কুলে থাকতেই লুকিয়ে চুরিয়ে কবিতা লেখার বাতিক ছিল। ফল্গু ধারার মতন প্রায় অন্তঃসলিলা। কিন্তু কলেজে উঠে সে ধারা তটপ্লাবিনী হ'য়ে উঠল, কূলপ্লাবিনীও। ফলে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সম্পাদকের দরজায় দরজায় ঘোরা। গলি-ঘুঁজিতে নতুন পত্রিকার আঁতুড়-ঘরে হানা। কাজেই পথ-ঘাট কিছুটা জানা হয়েছিল বৈ কি!

—তুই তারক দত্ত লেন চিনিস? সতেরোর বি?

তারক দত্ত লেনই চিনি না, তার আবার সতেরোর বি। কিন্তু সবেগে ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চিনি। নেহাত ছোট গলি তো নয়, বেশ বড় রাস্তা।

বড় রাস্তা বুঝি? রাঙামামীর গলায় উৎসাহের আমেজ।

—হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে কার কাছে যেতে হবে?

—মানে, ইয়ে, ওই যে, রাঙামামী আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়ালেন, আবার খুললেন, তারপর যেন দ্বিধা সঙ্কোচ জোর করে কাটিয়ে উঠেছেন এইভাবে বললেন, তোর মামার কাছে একবার যেতে হবে।

—মামার কাছে? মামা ওই ঠিকানায় থাকেন বুঝি?

—ওটা তো মেসবাড়ি। সেখানেই আছে অনেক দিন থেকে।

—মামাকে কি বল্‌ব?

রাঙামামী আবার বিব্রত হয়ে পড়লেন। আঙুল দিয়ে দাওয়ার ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বললেন, অনেকদিন মানুষটা আসে

নি। অসুখ-বিসুখেই পড়ল কিনা কে জানে! একবার গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসবি।

কথাটা আমার হঠাৎই মনে পড়ে গেল। লোকটার যে খোঁজ নেব, তাঁর নামই তো জানি না।

—মামার নামটা বলে দাও রাঙামামী, নইলে খোঁজ করব কি করে?

—দূর বোকা, রাঙামামীর সিঁথির সিঁদুর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জাজড়ানো গলায় বললেন, স্বামীর নাম মেয়েছেলেকে করতে আছে? দাঁড়া কোন বই-টইয়ে যদি নাম লেখা থাকে, দেখছি।

রাঙামামী উঠে পড়লেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন টেবিলের ওপর, ড্রয়ারের মধ্যে, বালিশের তলায়, তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা কাগজে নামটা লিখে কাগজটা আমার হাতে দিলেন।

গোটা গোটা অক্ষর। লেখার কোন ছিরি-ছাঁদ নেই। কিন্তু নামটা স্পষ্ট পড়া গেল। শ্রীহেমচন্দ্র রায়।

কাগজের টুকরোটা পকেটে ফেলে উঠে পড়লাম। মুখে বললাম, ঠিক আছে, আমি কাল বিকেলেই দেখা করব। সামনের শনিবার খবর নিয়ে আসব রাঙামামী।

রাঙামামীও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যদি অসুখ-বিসুখ দেখিস টুনু তো মাকে একটা চিঠি লিখে জানাস, তাহলেই আমি খবর পাব।

সোমবার ভোরে কলকাতা রওনা হওয়ার মুখে আবার রাঙামামীর সঙ্গে দেখা। চৌরাস্তার মোড়ে বটগাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন। শোন টুনু, যদি দেখিস অসুখ-বিসুখ কিছু নয় তো একটা কথা বলে আসতে পারবি?

—কি?

—বলবি, এ শনিবার যেন নিশ্চয় আসে, খুব দরকার। আমার মাথার দিব্যি দিয়ে আসতে বলবি, বুঝেছিস্ ?

ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি পা না চালালে সাতটা দশের গাড়ি ধরতে পারব না।

সত্যি সত্যিই পৌঁছেই বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম তারক দত্ত লেনের সন্ধানে। সহপাঠীদের কাছে অবস্থান সম্বন্ধে খোঁজ পেয়েছিলাম, কিন্তু ঘুরে ঘুরে হায়রান। ও নামের গলি মিলল না। ফিরে আসব ভাবছি, এমন সময়ে এক পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে নির্দেশ দিল। ভুবন হালদার লেন থেকে বেরিয়েছে। সরু শড়ক। তিন ফুট চওড়া। গলি নয় উপগলি। পাশাপাশি দু জন যাওয়া দুষ্কর। দু ধারে ইঁটের পাঁজর-প্রকট দেয়াল, বসন্তের গুটির মতন ঘুঁটের দাগ সর্বাঙ্গে। কানায় কানায় টইটুম্বুর ডাস্টবিন। উপচে কিছু রাস্তাতেও পড়ছে। একটু এগোতে সন্ধান মিলল। খড়ি দিয়ে বাড়ির দরজায় লেখা সতেরোর বি।

কড়ায় হাত ছোঁয়াবার আগেই দরজা খুলে গেল। বিরলকেশ ভদ্রলোক। একেবারে পিছনের দিকে ঝালরের মতন দু একগাছা চুলের ইশারা। পানের ছোপে শুধু ঠোঁটই নয়, দাঁতগুলোও রাঙা টুকটুকে।

বললেন, কাকে চাই ?

মামার নাম বললাম, শুনে ভদ্রলোক মাথায় হাত চাপড়ালেন। চোখ দুটো ছোট করে আমাকে আর একবার জরিপ করে বললেন, আপন মামা, মানে সাক্ষাৎ মামা ?

—একরকম তাই। ঠিক কি রকম মামা তা বোঝাতে গেলে সময় নেবে, তাই ওপথে গেলাম না।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, মামার খোঁজ আমরা আর আপনাকে কি দেবো বলুন? খোঁজ করুন গিয়ে পিয়ারী সরকার লেনে মালতীর বাড়ি, দিনরাত তো সেখানেই পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে মদ গিলে ফিরে আসেন মেসে, হৈ হল্লা করে আবার হাওয়া। তবে কিছু বলতে পারি না মশাই, মাসের প্রথম তারিখে ঠিক মত হিসেব মিটিয়ে দেন। একটু এদিক ওদিক নয়। আমার পাওনা মিটিয়ে দিলেই হ'ল। কে কোথায় কার বাড়ি পড়ে আছে, তাতে আমার কি দরকার, কি বলুন?

কোন উত্তর দিলাম না। পায়ে পায়ে সরে এসে গলির ওপর দাঁড়ালাম। শুধু সুরা নয়, সাকীও আছে মামার। সেইজন্যই বোধ হয় বাঙামামীর কাছে আসবার অবকাশ মেলে না। শনিবার, শনিবার তো নয়ই, মাসে একবারও নয়।

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করতে যাবার মুখেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, একটা কথা বলতে পারবেন মামাকে?

—তা কেন পারব না। তবে সর্বদাই ঘোড়ায় চড়ে থাকেন কিনা, আমাদের ছোট কথা কানে তুললে হয়।

—বলবেন বাঙামামীর খুব অসুখ। একবার যেন দেখা করেন।

—বাঙামামী? বিস্ময়ে আর কৌতূহলে ভদ্রলোকের দুটো চোখ চিক চিক করে উঠল।

—মানে, ওই মামার স্ত্রী।

—তা বুঝেছি। আচ্ছা বলবো'খন। অফিস থেকে সোজা যদি এখানে ফেরেন তো নিশ্চয় বলব।

পরের শনিবার বাড়ি গেলাম বটে কিন্তু বাঙামামীকে এড়িয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কিছু কিছু মাকে বললাম। সব কথা সোজাসুজি বাঙামামীকে বলতে সঙ্কোচে বাধল।

তারপর অনেকদিন আর রাঙামামীর সঙ্গে দেখা হয় নি। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মাকে নিয়ে শহরে বাসা বাঁধলাম। বি. এ. পরীক্ষায় বার দুয়েক মুখ থুবড়ে এক বেসরকারী অফিসের ফাইল ক্লার্কের চেয়ারে বসলাম। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। ইতিমধ্যে কবিতা ছেড়ে গল্প ধরেছি। দু একটা বইও বাজারে বেরিয়েছে। যত খেটে লিখেছি, সে অনুপাতে নাম অবশ্য হয় নি। পকেটও ভরে নি। মাগ্‌গী-ভাতা নিয়ে সাতানব্বই টাকা মাইনে, তার মধ্যে পঁচিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাকি যা থাকে তাতে দু জনের গ্রাস বা আচ্ছাদন কোনটাই পুরো-পুরিভাবে চলে না।

বাড়তি রোজগার হিসাবে বইয়ের ক্যানভাসারের পোশাক অঙ্গে জড়ালাম। ঝামেলার কাজ। বইয়ের বস্তা হাতে নিয়ে মফস্বলে মফস্বলে ঘোরা। সেক্রেটারি আর হেডমাস্টারদের দরজায় ধর্না। নানা জিনিসপত্র ঘুষ। ছানাবড়ার হাঁড়ি থেকে অসময়ের কপি। পরিবর্তে শুধু দু একখানা বই তাঁরা চালু করবেন। নব স্বাস্থ্য কথা কিংবা ভূগোল প্রকাশ। একটু দূরে কোথাও যেতে হলে মাঝে মাঝে অফিস থেকে ডুব। মার অসুখ কিংবা নিজের জর। শুধু বাঁচবার জন্যই এই মিথ্যা-চারের আশ্রয়টুকু নিতে হত। প্রাণধারণের গ্লানি।

সেদিন মলয়পুরের স্কুলবাড়ি থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল। এই তো কাছেই রাঙামামীর বাড়ি। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। একবার দেখা করে গেলেই হয়।

রাঙামামী দাওয়ায় খোলা উনানে মুড়ি ভাজছিলেন, গিয়ে দাঁড়াতেই লাফিয়ে উঠলেন, কে, টুনু না? আয়, আয়। খুব ছেলে যা হোক, আর এ পথ মাড়াতে নেই! রাঙামামী বাঁচল না মরল সে খোঁজই নয়।

শুধু শাড়ির পাড় থেকেই রাঙামামী রঙ মুছে ফেলেছিলেন, দেহের আর কোথাও রঙের অভাব হয় নি। শক্ত সমর্থ শরীর, সুগৌরবর্ণ, এক মাথা ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। বয়সের কোন ছাপ নেই সারা শরীরে।

খুব আস্তে বললাম, এ সর্বনাশ কবে হল রাঙামামী ?

—সর্বনাশ! ওঃ, রাঙামামী নিজেকে সামলে নিলেন, তোরা চলে যাবার বছর খানেক পরেই। কিছুই জানি না রে টুনু! হঠাৎ একদিন দুজন ভদ্রলোক ওর বিছানাপত্র আর সুটকেশটা দিয়ে গেল। তারাই বলল, হাসপাতালে সব শেষ হ'যে গেছে। লিভারের কি একটা অসুখ বলল।

রাঙামামী একটু থামলেন। ধরা ধরা গলা। মাথা নিচু করে কি ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর থেমে থেমে বললেন, দিন সাতেক পরে অফিস থেকেও একটা চিঠি এসেছিল। ভট্‌চাযদের সাতুকে নিয়ে কলকাতায় যেতে হযেছিল। সই সাবুত। অনেক ঝামেলার পর ওঁর অফিসের জমানো টাকা হাতে এসেছিল। সেই পোস্টাফিসে জমা রেখেছি। সুদ কিছু পাই আর এই মুড়ি ভাজার কাজ। আমায় বেরোতে হয় না, যার দরকার তারাই বাড়ি থেকে নিয়ে যায।

এবাব আর রাঙামামীকে চিনতে অসুবিধা হয় না। নিজের মধ্যে দিয়েই যেন চিনতে পারি। বাড়িতে রোজগারের জন্য আমার যেমন বইয়ের দালালি, রাঙামামীর তেমনি মুড়ি ভাজা। তবে আমার চেয়ে রাঙামামীর সুবিধা এই যে আমায় যেমন স্কুলের দরজায় দরজায় ফেরি করে বেড়াতে হয, রাঙামামীর তা নয়। খদ্দের এসে তাঁর দরজায় দাঁড়ায়।

রাঙামামীর কথায় চমক ভাঙল, তুই তো আজকাল মস্ত বড় লেখক ?

—লেখক, কে বললে ?

—বলবে আবার কে! ষষ্ঠীতলা লাইব্রেরি থেকে তোর বই আনিয়ে যে পড়ি। সুরের বাঁধন, এই সেদিন কি যে একটা পড়লাম, শ্বেতপদ্ম।

—আসল ব্যাপারটা আর রাঙামামীর কাছে ভাঙলাম না। বই বেরোলেই নিজের খরচে ষষ্ঠীতলা লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই। মলয়পুরে ছেলেবেলা থেকে মানুষ। আমি যে লেখক হয়েছি এ খবরটা এখানে না দিতে পারলে শান্তি নেই। পাড়ার সঙ্গীরা, যারা অনেক খোশামোদের পরেও কবিতার একটি লাইন শুনতে চায় নি, তারা জানুক কি ভাবে একজন প্রতিভাবান লেখক অবহেলায় অবজ্ঞায় এখানে তার শৈশব আব কৈশোর কাটিয়ে গেছে।

তারপরই রাঙামামী আসল কথাটা পাড়লেন, টুনু, এত তো বই লিখছিস, আমাকে নিয়ে একটা বই লেখ না!

—আপনাকে নিয়ে?

—হ্যাঁ, কেন, লেখা যায় না আমাকে নিয়ে? তোব মামাকে নিয়ে কি ভাবে জ্বলে পুড়ে মলাম সাবাটা জীবন, নিজেব জিনিস পবেব হাতে—তাও হেসেছি, ঘোরাফেবা করেছি মনের আনন্দে। এই সব নিয়ে গল্প হয় না?

—কেন হবে না?

—তবে লেখ না টুনু! বানিয়ে বানিয়ে কিছু লিখতে হবে না তোকে। যা সত্যি তাই লেখ। লিখবি?

কথা দিয়েছিলাম লিখব। মাঝে মাঝে ভেবেওছি মনে মনে। শনিবার রাতে খুঁটিতে হেলান দিযে বসে থাকা, মাঝরাতে গানেব টুকরো, হাতের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা, তারপর পিযারী সরকার লেনের কে এক মালতী। রাঙামামীর জীবন যে বিষাক্ত করে

তুলল। লেখা যায় বই কি, বেশ লেখা যায়! কিন্তু খাতা-কলম নিয়ে বসতেই লেখা এক লাইন এগোয় নি। এত জলন্ত সত্য কথা নিয়ে বুঝি উপন্যাস ফাঁদা যায় না। কোথাও ফাঁক নেই, ফাঁকি নয়। নিটোল বাস্তব।

এরপর যতবার মলয়পুরে এসেছি, দেখা করেছি রাঙামামীর সঙ্গে। ঐ এক কথা, এক অনুযোগ।

—কইরে টুনু, কবে আরম্ভ করবি ? লিখেছিস কিছু ?

—কিছু কিছু হযেছে রাঙামামী।

—হয়েছে ? রাঙামামী উৎসাহে দাঁড়িযে উঠতেন, এরপরে যেদিন আসবি, খাতা নিয়ে এসে শুনিযে যাবি, কেমন ?

উত্তরে ঘাড় নেড়েছি।

আবার অনেকদিন দেখা হয়নি রাঙামামীর সঙ্গে। মলযপুরে যাবার সুযোগই হয়নি। এর মধ্যে আর একটা বই লিখেছি। কিন্তু রাঙা-মামীকে নিযে নয়।

সুযোগ জুটে গেল। এক গাদা বই নিয়ে মলয়পুর নিস্তারিণী বিদ্যালয়ের দরজায এসে দাঁড়ালাম। আরো অনেক ক্যানভাসার বেরিয়েছে অন্য প্রতিষ্ঠানের বই নিযে। কাজেই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন যে আগে বুড়ি ছুঁতে পারবে, তারই লাভ। বরাত! সেক্রেটারি গিয়েছেন মেয়ের বাড়ি। পরের দিন সকালে ফিরবেন। দেখা করতে হ'লে মলযপুরে রাতটা কাটাতে হয়। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

রাঙামামীর কথা মনে পড়ল। রাত কাটাবার আস্তানা। বইয়ের থলি হাতে উঠানে গিযে দাঁড়ালাম। গলার আওয়াজে রাঙামামী ভেতর থেকে বাইরে এলেন।

—কে রে, টুমু ?

—হ্যাঁ রাঙামামী।

—হাতে কিরে ?

—বই। কথার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ঝোলাটা দাওয়ায় নামিয়ে রাখলাম।

—বই! রাঙামামী এগিয়ে এলেন, তোর নতুন বই বেরল বুঝি? হাসি এল। হায়রে, সে ভাগ্যই করেছি কিনা! বুঝিয়ে শুনিযে পরকে গছাচ্ছি, নিজের নয় পরেরই বই।

—না রাঙামামী, ওসব স্কুলের বই। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্য। নতুন বই লিখছি তোমাকে নিয়ে, মাস দুয়েকের মধ্যেই বেরিযে যাবে।

রাঙামামী ঝোলার দিকে নিচু হযেছিলেন, আমার কথা শুনে টান হয়ে দাঁড়ালেন। মুখে একগাল হাসি। বললেন, বললি বেববার আগে দেখিয়ে যাবি আমাকে? যা-তা ছাই-পাঁশ দিযে ভরিযে দিচ্ছিস না তো? একটু মিথ্যে কথা কোথাও লিখতে পাববি না কিন্তু। তোর মামার কোন দোষ ঢাকতে পারবি না।

আর কথা বাড়ালাম না। আসাব উদ্দেশ্য বললাম। দোকান থেকে চা আর রুটি খেয়ে এসেছি। রাতটা তাতেই কেটে যাবে। শুধু একটু শোবার ব্যবস্থা।

কোন অসুবিধা নেই। আমার বিছানা হল তক্তপোশের ওপব, রাঙামামী দাওয়ায়।

শরীর এমনিতেই ক্লান্ত ছিল। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। খুটখাট শব্দ। বিড় বিড় করে

কার যেন কথা বলার আওয়াজ। আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। দরজা ভেজানো ছিল। খুলে দেখলাম, রাঙামামী দাওয়ায় নেই।

দাওয়ায় নেমে কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকের ছোট একটা ঘর। ভাঙা তোরঙ্গ, ছেঁড়া কাপড় থেকে শুরু করে কাঠ, ঘুঁটে, নারকেল পাতা বোঝাই।

মাটির প্রদীপ জ্বলছে। কাঠের বাক্সের গায়ে ফটোটা হেলান দেওয়া। শুকনো ফুলের মালা জড়ানো। ফটোর সামনে মাথা রেখে রাঙামামা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

ফটোটা কার এ বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। একবার ভাবলাম পা টিপে টিপে ফিরে যাই বিছানায়, কিন্তু নিছক কৌতূহলের বশে এগিয়ে গেলাম।

মামার ফটো—কিন্তু শুধু মামারই নয়, পাশে আর একটি মেয়ে। চুল বাঁধার ধরনে, চোখ-মুখের ঢংয়ে মেয়েটি যে কোন শ্রেণীর তা আর বুঝতে অসুবিধা হল না।

বোধ হয় মুখ থেকে বিস্ময়-সূচক কোন অব্যয় বেরিয়ে গিয়ে থাকবে, কিংবা পায়ের শব্দ একটু জোর, রাঙামামী পিছন ফিরলেন। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ফটোটা লুকিয়ে ফেললেন আঁচলের তলায়। হেসে ফেললাম, বললাম, ওটা লুকিয়ে লাভ নেই রাঙামামী, আমি দেখে ফেলেছি।

রাঙামামী একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। দু গাল বেয়ে জলের ধারা। নাকের পাটা দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। কি ভেবে ফটোটা বের করলেন কাপড়ের তলা থেকে, একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, ট্রাঙ্ক থেকে পেয়েছি। কতদিন ভেবেছি ওর ফটোটা আলাদা করে নেব, ছিঁড়ে ফেলব বাকিটা, কিন্তু ছিঁড়তে গিয়েও পারি নি।

বারবার মনে হয়েছে, ও তো একেই সত্যি ভালবাসত, বেশির ভাগ সময় এর কাছেই কাটত, একে পেয়েই আমাকে ভুলে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম পরকাল বলে যদি কিছু থাকে, মানুষের আত্মা থাকে, তাহলে এ কটো আলাদা করলে সেখানে ও কষ্ট পাবে। তাই ওটা আর ছিঁড়ি নি টুনু! ও যাতে সুখী হয়, যাতে আনন্দে থাকে, তাই তো আমার করা কর্তব্য, কি বল ?

কি বলব! এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। স্বল্প আলোয় রাঙামামীকে আর একবার ভাল করে দেখলাম। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলেছেন, কোথাও একটু দাগও নেই, সামান্য দুর্বলতাও নয়।

মনে হল রাঙামামীকে নিয়ে উপন্যাস রচনা চলে. কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠতর কোন লেখনীর, স্থিতপ্রজ্ঞ কোন সাহিত্যিকেব।

বাঈজী

আনোয়ারীবাঈ ঘরে ঢুকতেই মনোহরপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল। হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করল, তারপর নিজের মেহেদীপাতার রংয়ে ছোপানো দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

আনোয়ারীবাঈ কার্পেটের ওপর বসলেন। মনোহরপ্রসাদের মুখোমুখি। আজকাল বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কোমর টন টন করে। বাতের মরসুম শুরু হয়েছে। ভরা শীতকালে আর উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈয়ের খুবই আশ্চর্য লাগে। মনেই হয় না, বছর বারো আগে হাঁটু মুড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়েছেন। রাত ভোর হয়ে গিয়েছে ঠুংরী আর গজলে। এখন একটা দুটো গান গাইতে গেলেই হাঁপ ধরে।

—কি ব্যাপার ভাইসাহেব, ভোর ভোর? আনোয়ারীবাঈ চুল-সরু খাঁজ ফেললেন কপালে। এত ভোরে ঘুম ভাঙানোতে মেজাজ খুশ নয় মোটেই।

—একটা জরুরী খবর ছিল, মনোহরপ্রসাদ দাড়ি ছেড়ে হাঁটুতে হাত বোলাতে আরম্ভ করল। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব।

আগের দিন ঠিক এমনিভাবেই মনোহরপ্রসাদ খবর আনতো। ছিপছিপে ফরশা চেহারা, হাতের ছোঁয়ায় তবলা যেন কথা বলত। মুজরো নিয়ে বাইরে যাবার সময় আনোয়ারীবাঈ সব সময়ে মনোহরপ্রসাদকে সঙ্গে নিতেন। কোন ঝামেলা নেই, বদ অভ্যাস নয়।

ঘাড় হেঁট করে নিজের কাজ করে যেত। আনোয়ারীবাঈয়ের শুধু তবলচীই ছিল না মনোহরপ্রসাদ, এধার ওধার থেকে খবরের টুকরোও সেই সংগ্রহ করত।

—আজ রায়-বেরিলির খানসায়েব এসেছেন। এখানে থাকবেন হপ্তা খানেক। খানসায়েব ঠুংরীর বড় ভক্ত, দেখি একবার যোগাযোগ করে। কাল পরশু আপনার কোন বায়না নেই তো কোথাও?

মনোহরপ্রসাদ জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে চাইত আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে।

—না, বায়না আর কোথায়, আনোয়ারীবাঈ ঘাড় নাড়তেন, বায়না থাকলে আর তুমি জানতে পারতে না?

তা ঠিক। মনোহরপ্রসাদও ঘাড় নেড়েছে। এমনি নানা খবর।

—আজ রাতে মীর্জা হোসেন আসবেন গান শুনতে। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ সংবাদ আনল।

—আজ রাতে? সর্বনাশ! বিস্ময়ে আনোয়ারীবাঈ চোখ কপালের মাঝ বরাবর তুলেছেন, আজ যে ডাক্তার জনার্দন সুকুল আসবেন, তিনদিন আগে খবর পাঠিয়েছিলেন?

ও ঠিক আছে, নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিয়েছে মনোহরপ্রসাদ, আমি তাঁকে বারণ করে এসেছি। বলেছি আপনার তবিয়ৎ খারাপ। দিন সাতেক পরে আসর বসবে।

—কিন্তু কাজটা কি ঠিক হল ভাইসাযেব? আনোয়ারীবাঈ আমতা আমতা করেছেন।

মীর্জা হোসেন কাল সকালে হাযদ্রাবাদ ফিরে যাচ্ছেন। বছর খানেকের আগে আর এ মুখো হবেন না। আর সুকুল সাযেব তো ঘরের লোক!

আনোয়ারীবাঈ রাজী। কোনদিন মনোহরপ্রসাদের কথার ওপর

কথা বলেন নি। এটুকু জানতেন, মনোহরপ্রসাদ যা করবে আনোয়ারী-বাঈয়ের ভালোর জন্তই। নিজের দিকে চাইবে না, গায়েও মাখবে না দুঃখ কষ্ট। সুকুল সায়েবের চেয়ে মীর্জা হোসেন পয়সা কম ঢালবে বলে নয়, হোসেন সায়েব গানের অনেক বেশি সমঝদার। ঠিক জায়গায় তারিফ করতে জানেন, বুঝতে পারেন গলার সূক্ষ্ম কাজের কেরামতি। সুকুল সায়েবের এ সবের বালাই নেই। গান শুরু হতেই তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েন। ঠিক গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে ঘাড় নেড়ে বলেন, কেয়াবাত! কেয়াবাত! বড় মিঠে গলা বাঈজীর। ভারি মিঠে।

আজ নিশ্চয় এ সব কথা বলতে মনোহরপ্রসাদ আসে নি। গান ছেড়ে দিয়েছেন আনোয়ারীবাঈ। মনোহরপ্রসাদও আর তবলা ছোঁয় না। গান বাজনার সম্পর্ক নেই, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক ঘোচে নি। সময় পেলেই মনোহরপ্রসাদ ঘুরে যায় একবার। পা মুড়ে বসে ফেলে আসা সুখ-দুঃখের গল্প চলে। জমানা বিলকুল বদলে গেছে, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ।

আনোয়ারীবাঈ বিস্মিত হলেন, হেসে বললেন, আর জরুরী খবরে দরকার কি ভাইসায়েব! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এবার যা কিছু জরুরী খবর আসবে একেবারে ওপার থেকে।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে কার্পেটের একটা ফুল খুঁটতে খুঁটতে আস্তে বলল, মোতি এসেছে শহরে।

মনোহরপ্রসাদের কথার টুকরো কানে যেতেই আনোয়ারীবাঈ টান হয়ে বসলেন। একটা হাত রাখলেন কানের পাশে। মনোহরপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, কে এসেছে? কে এসেছে শহরে?

মনোহরপ্রসাদ মাথা তুলল, গলাও চড়াল একটু, মোতি এসেছে,

মোতি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে মেজর বর্মা লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়েছেন।

বুঝতে বেশ একটু অসুবিধা হল আনোয়ারীবাঈয়ের। অস্পষ্ট কতকগুলো হিজিবিজি রেখা। অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন কিছুক্ষণ, মোতি, মোতিবাঈ, মোতিবাঈ এসেছে শহরে।

দু একদিনের কথা নয়। দেড় যুগেরও বেশি, তখন কত বয়স মোতির। বড় জোর পাঁচ কি ছয়। দু পাশে বেণী দোলানো, রঙীন শালোয়ার পাজামা পরা ফুটফুটে মেয়ে। ছুটে ছুটে বেড়াতো এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে দোস্তি। চেয়ে চেয়ে আনোয়ারীবাঈয়ের আশ আর মিটতো না। কোনদিন যে মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল আনোয়ারীবাঈ, পাতানো নয়, সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, পরের যুগের গজল-ঠুংরী-খেয়ালের সুরে বাঁধা জীবন নয়, পা ফেলা নয় তবলার বোলের তালে পা মিলিয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখে ঘেরা জীবন, সামাজিকতার গণ্ডীর মধ্যে সাবধানে পা ফেলে চলা, মোতি আনোয়ারীবাঈয়ের সেই ফেলে আসা জীবনেরই চিহ্ন।

শুধু মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ চমকে উঠতেন। আগুন জ্বলে উঠত মাথায়। যখন দু একজন গানের ওস্তাদ, আশপাশের দু একজন রসিক আদমি মোতিকে আদর করতে করতে বলত, আর কেন আনোয়ারী, এবার মেয়েকে গান বাজনা শেখাতে আরম্ভ কর। এখন থেকে শুরু করলে তবে বয়সকালে মার মতন মিঠে গলা পাবে, নাম রাখবে লক্ষ্ণৌর।

মুখে আনোয়ারীবাঈ কিছু বলেন নি, কিন্তু মনে মনে শিউরে উঠেছেন। মানুষজন সব সরে যেতে, বাড়ি খালি হয়ে যেতে মোতিকে

বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছেন। মোতির ঠোঁটে, গালে চুমু খেতে খেতে বলেছেন, না, তোকে আমি কিছুতেই এ পথে নামতে দেবো না। কিছুতেই না।

মনের ইচ্ছাটা আড়ালে ডেকে মনোহরপ্রসাদকে বলেওছিলেন অনেকবার।

—মোতিকে আমি সরিয়ে দিতে চাই এখান থেকে। নাচ গান হৈ হল্লা এসব যেন ওর জীবনে কোনদিন না আসে।

মনোহরপ্রসাদ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। এ আবার কি কথা! আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে গান বাজনা শিখবে না তো বেনারস গিয়ে মালা জপবে বসে বসে? তীর্থধর্ম শুরু করবে উঠতি বয়সে?

তীর্থধর্ম করবে কেন এ বয়সে? সংসার করবে। মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঘর পাতবে।

নিজের ফেলে আসা সাজানো সংসারের কথা ভেবেই আনোয়ারী-বাঈ উদ্গত নিশ্বাস চাপলেন।

ঘর সংসার করবে মেয়ে। তা বেশ, কিন্তু জেনে শুনে চকের আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়েকে কে এগিয়ে আসবে বিয়ে করতে! ওড়না ফেলে কে মাথায় ঘোমটা দেওয়াবে! দু একজন কাঁচা বয়সের কচিডানা মেলে সবে উড়তে শেখা ছোকরা হয়তো রাজী হতেও পারে। বিয়ের ভড়ং করে নিয়ে গিয়ে ফূর্তি করবে কদিন। তারপর সখ মিটলে কিংবা বাপের দেওয়া মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলে ফেলে পালাবে মোতিকে। তখন!

কাজটা যে সোজা নয়, তা আনোয়ারীবাঈ ভালই জানেন। আর জানেন বলেই মনোহরপ্রসাদকে ডেকেছেন শলা-পরামর্শ করতে।

একটা উপায় আছে। আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলেন মনোহরপ্রসাদের হাতের ওপর।

কি উপায়? মনোহরপ্রসাদ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

বার কয়েক ঢোঁক গিললেন আনোয়ারীবাঈ। কপালে জমে ওঠা ঘামের বিন্দু সুরভিত রুমাল দিয়ে মুছে নিলেন, তারপর বললেন, এমন করা যায় না ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারা কোন অনাথা মেয়ে। তিন কুলে দেখবার কেউ নেই। কোন ভদ্রলোক যার ছেলেপিলের সাধ অথচ ভগবান কিছু পাঠান নি কোলে, তেমন কেউ মোতিকে নিতে পারে না? নিজের মেয়ের মতন মানুষ করতে পারে না?

সর্বনাশ, বিলিয়ে দেবেন মেয়েকে। কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে আনোয়ারীবাঈ বাঁচবেন কি করে?

—আনোয়ারীবাঈ বাঁচতে চায় না। মেয়েকে বাঁচাতে চায়! আনোয়ারীবাঈয়ের গলা ধরাধরা।

মনোহরপ্রসাদ বোঝাতে চেষ্টা করল। ব্যাপারটা আনোয়ারীবাঈ ভাল করে ভেবে দেখুন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসের ঘোরে এমন একটা কাজ করলে আপসোসের অন্ত থাকবে না। শেষ জীবনে যখন পঙ্গুত্বের অভিশাপ নামবে, দেহ জরাগ্রস্ত হবে, হাজার চেষ্টাতেও গলায় মিঠেসুর ফুটবে না, তখন এই মেয়েকে আশ্রয় করেই তো বাঁচতে হবে। এরই রোজগারে দিন কাটাতে হবে। আর কি অবলম্বন থাকবে?

অবলম্বন? আনোয়ারীবাঈ হাসলেন। করুণ হাসি। মনোহর-প্রসাদের দিকে চেয়ে বললেন, শেষ জীবনে মেয়ের চেয়ে আরো বড় কিছু অবলম্বনের খোঁজ করব ভাইসাহেব। সারাটা জীবন তো ছিনিমিনি খেললাম নিজেকে নিয়ে, তখন মালেকের কথা ভাববো। তাঁর হাতেই ছেড়ে দেবো নিজেকে।

এর ওপর আর কথা চলে না। তবু মনোহরপ্রসাদ একবার শেষ চেষ্টা করল, কিন্তু মোতি থাকতে পারবে আপনাকে ছেড়ে ?

আনোয়ারীবাঈ আবার হাসলেন, মানুষের পরমায়ুর কথা কেউ বলতে পারে ? হঠাৎ যদি মারাই যায় আনোয়ারীবাঈ, তাহলেও তো আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে মোতিকে। হাজার কাঁদলেও আমাকে ফিরে পাবে না। না, ভাইসাযেব, আনোয়ারীবাঈ গলার সুর নরম করলেন, ভেজা ভেজা স্বর, একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। মোতিকে আমি এ নরকে বাড়তে দেবো না। ওকে কোথায়ও সরিয়ে দিতেই হবে। তুলে দিতে হবে কোন ভদ্র মানুষের হাতে।

মনোহরপ্রসাদ ঘাড় নেড়েছিল বটে, কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারে নি। আনোয়ারীবাঈ ভোলেন নি কথাটা। গান-বাজনার শেষে ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে সেই এক মিনতি জানিয়েছিলেন মনোহর-প্রসাদকে। আর দেরি নয়, মেয়ে বড় হচ্ছে। বুঝতে শিখছে। যা কিছু করতে হয়, এই বেলা। গাছ একটু বড় হয়ে গেলেই তাকে ওপড়ানো মুশকিল। মাটির গভীরে চলে যায় শিকড়, ডালপালা বিস্তৃত হয় দিকে দিকে, তখন টানাটানি করতে গেলে ক্ষতিই হয়। লক্ষ্ণৌতে সে রকম কেউ না থাকে, মনোহরপ্রসাদ আশপাশে ঘুরে দেখুক। ঘোরবার সব খরচ আনোয়ারীবাঈ দেবেন, কিন্তু আর দেরি নয়।

বরাত ভালো মনোহরপ্রসাদের। এদিক ওদিক ঘুরতে হয়নি। কাছে-পিঠেই খোঁজ পাওয়া গেল। সুন্দরবাগে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন, স্ত্রীকে নিয়ে। যে বাড়িতে উঠেছেন, সেই বাড়িওয়ালা মনোহরপ্রসাদের দোস্ত। কথায় কথায় ব্যাপারটা তার কাছ থেকেই জানা গেল।

ভদ্রলোক সরকারের বড় চাকরে। সারা ভারতবর্ষে চাকরির অন্ন ছড়ানো। ঘুরে ঘুরে সেই অন্ন খুঁটে তুলতে হয়। বছর তিনেক পর পর বদলি হন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। পয়সাকড়ি, ইমানইজ্জত সব আছে, কেবল সুখ নেই। বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল, আজমগড়ে দুদিনের জ্বরে মেয়েটি শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া গেল না। সেই থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রী অনবরত কাঁদেন আর বুক চাপড়ান। অভিশাপ দেন ভগবানকে। ভদ্রলোক এসব কিছু করেন না। অফিসের সময়টুকু ছাড়া চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন দরজা জানলা বন্ধ করে।

মনোহরপ্রসাদ আসমানের চাঁদ পেল হাতের মুঠোয়। তকলিফ ক'রে আসমানে চড়তে হ'ল না, চাঁদ নিজেই যেন নেমে এসে ধরা দিল।

দোস্তের মারফত আলাপ হল। প্রথম প্রথম দু-একটা সান্ত্বনা'র মোলায়েম কথা, মিঠে মিঠে উপদেশ, দুনিয়ায় কিছুই স্থায়ী নয় সে সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লো। খুব সাবধানে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মনোহরপ্রসাদের দিকে, তারপর ধীরগলায় বললেন, কিন্তু যাদের মেয়ে তারা ছাড়বে কেন ?

ছাড়বে কেন! মনোহরপ্রসাদ কপালে হাত চাপড়ালেন, বাপ গেছে অনেকদিন, মা যে অবস্থায় আছে, দুবেলা দুখানা রুটিও দিতে পাচ্ছে না মেয়েকে। কোনদিন দেখবো মা আর মেয়ে দুজনেই খতম হয়ে গেছে। নয়তো, মা কি আর সহজে ছাড়তে চায় মেয়েকে!

ভদ্রলোক উঠে ভিতরে গেলেন, বোধহয় পরামর্শ করলেন স্ত্রীর সঙ্গে, তারপর বাইরে এসে বললেন, একবার দেখাতে পারেন মেয়েটাকে ?

—বহুৎ খুব, বলেন তো কালই নিয়ে আসতে পারি।

—বেশ। তাই নিয়ে আসবেন।

সোজা মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করল। সব ঘটনা জানাল। পরের দিন সকালে মোতিকে নিয়ে যাবে তাও বলল।

মনোহরপ্রসাদ ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক হলে আনোয়ারীবাঈ বোধহয় রাজী হবেন না। প্রাণ ধরে ছাড়তে পারবেন না মেয়েকে। কিন্তু আনোয়ারীবাঈ একটুও আপত্তি করলেন না। সামান্য বাধাও নয়। কেবল বললেন, লোক বেশ ভালো তো ভাইসায়েব? মোতির কোন কষ্ট হবে না?

—নিজের পেটের মেয়ে হারিয়েছে, এখন যাকে নেবে, তাকে নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করবে। আর তাছাড়া লোক খুব ভদ্র। খানদানী ঘরের ছেলে, শুনলাম লেখাপড়াও খুব জানে।

আনোয়ারীবাঈ আর কিছু বললেন না, কিন্তু পরের দিন মনোহর-প্রসাদ মোতিকে নিতে গিয়েই অবাক। দামী শালোয়ার, দোপাট্টা, পায়জামায় ঝলমল করছে মেয়ে। গলায় মুক্তার মালা, কানে পান্নার দুল। পায়ে ভেলভেটের নাগরা।

সর্বনাশ, এই বুঝি অভাব অনটনে দিন কাটানো মেয়ের পোশাকের বহর!

কথাটা মনোহরপ্রসাদ বললো আনোয়ারীবাঈকে।

—এত সব দামী জামা গয়না পরিয়েছেন কেন? গরিবের মেয়ে—এই কথাই তো জানানো হয়েছে।

তবে? এই এতক্ষণ পরে একটু যেন ছলছলিয়ে এল আনোয়ারী-বাঈয়ের চোখ। ভিজে ভিজে গলা।

—সব খুলে ফেলব?

মনোহরপ্রসাদ ভাবল দু এক মিনিট, তারপর বলল, শালোয়ার পাজামা না হয় থাক, গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

আনোয়ারীবাঈ এক এক ক'রে সব খুলে নিলেন। মেয়েকে সারারাত ধরে বুঝিয়েছেন। নতুন জায়গায় গিয়ে বেফাঁস যেন কিছু না বলে ফেলে, কান্নাকাটি না করে। বাইরে যাবেন আনোয়ারীবাঈ। তীর্থ ধর্ম করতে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের যেতে নেই। ফিরে এসে মোতিকে তিনি নিয়ে আসবেন।

—কার কাছে যাবো মা! মোতি অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছে।

—তোমার কাকা কাকীর কাছে। দেখবে কত যত্ন করবে, ভালবাসবে, জিনিস কিনে দেবে।

মোতি আর কথা বলে নি। এখানে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ শহরে যান মুজরো নিয়ে। খুব দূরে কোথাও নয়, ধারে কাছেই। কানপুর, বেরিলি, ফয়জাবাদ। সেই সময় মোতি থাকে বুড়ি ঝির কাছে। এখানে থাকলেও আনোয়ারীবাঈ ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না মেয়েকে। গান বাজনার আসরে এসে কাজ নেই। সারেঙ্গীর সুর আর তবলার বোলে শুধু সুর নয়, বিষও আছে। একবার নেশা ধরলে আর রক্ষা নেই।

মোতিকে নিয়ে যাবার সময় ধারে কাছে আনোয়ারীবাঈকে দেখা গেল না। এদিক-ওদিক চেয়েও মনোহরপ্রসাদ তাঁর খোঁজ পেলেন না।

ভদ্রলোকের নাম ব্রজবিলাস শকসেনা। আদি নিবাস মজঃফরপুর। বিলেতে ছিলেন বছর চারেক। স্ত্রী পর্দানসীন নন, কেবল আনকোরা শোক পেয়ে বাইরে বেরোনো বন্ধ করেছেন। মোতিকে দেখে

ব্রজবিলাসবাবুর স্ত্রী পর্দা ঠেলে সদরে চলে এলেন। দুহাতে মোতিকে বুকের মধ্যে জাপ্‌টে ধরে ভেঙে পড়লেন কান্নায়। ব্রজবিলাসবাবু কাঁদলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মুখ চোখের ভাবে মনে হ'ল, মেয়ের শোকটা আবার নতুন করে যেন দেখা দিল।

মোতিকে তাঁরা ছাড়লেন না। কথা হ'ল মনোহরপ্রসাদ বিকেলে এসে মোতিকে নিয়ে যাবে, আবার পরের দিন সকালে মোতির জামা-কাপড় বিছানাপত্র যা আছে সবশুদ্ধ নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে মোতিকেও।

যাবার মুখে ব্রজবিলাসবাবু মনোহরপ্রসাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—কিছু টাকা, ওর মাকে দিতে চাই। যদি আপনি নিয়ে যান সঙ্গে করে। মনোহরপ্রসাদ দুহাত যোড় করল। বিনীত গলায় বলল, কসুর মাফ করবেন। টাকা নিতে ওর মা হয়তো রাজী হবেন না। তাহলে মেয়েকে বিক্রি করার সামিলই হবে। মেয়েকে মানুষ ক'রে তুলুন আপনারা, তাতেই উনি খুশি হবেন।

তারপর থেকে মেয়ের সঙ্গে আর আনোয়ারীবাঈয়ের দেখা হয়নি। দেখা হয়নি বটে, তবে খোঁজ-খবর পেয়েছেন মনোহরপ্রসাদের মারফত। বছর তিনেক পরেই ব্রজবিলাস বদলি হলেন মীরাট, সেখান থেকে দেরাদুন ছুঁয়ে গেলেন আগ্রা। সব জায়গা থেকেই চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন মনোহরপ্রসাদের সঙ্গে। চিঠিতে বেশির ভাগই মোতির কথা। মোতির মা যে বাঈজী ছিলেন, সেকথা মোতির কাছ থেকেই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কোন আক্ষেপ নেই। পিছন দিকে চাইতে আর তাঁরা রাজী নন। পুনর্জন্ম হয়েছে মোতির।

আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি, এখন সে মোতিকুমারী শকসেনা, ব্রজবিলাস শকসেনা, সিনিয়র অফিসরের একমাত্র মেয়ে।

তারপর বছর কয়েক কোন খবর নেই। পুরোনো ঠিকানায় চিঠি দিয়েও মনোহরপ্রসাদ কোন উত্তর পাননি। হঠাৎ চিঠি এল মজঃফরপুর থেকে। লিখেছেন মায়াবতী শকসেনা, ব্রজবিলাসের বিধবা স্ত্রী। সামনের মাসে মোতির বিয়ে, আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বর্মার সঙ্গে। তাঁর স্বামী হঠাৎই মাবা গেছেন। অফিসের টেবিলে হার্টফেল ক'রে। এই বিয়েতে মনোহরপ্রসাদ অনুগ্রহ করে যদি পায়ের ধূলো দেন তো সবাই কৃতার্থ বোধ করবে।

মনোহরপ্রসাদ যেতে পাবেনি, কিন্তু আনোযারীবাঈকে পড়িযে শুনিয়েছিলো সে চিঠি। তখন আনোযাবীবাঈযেব অবস্থা পড়তির মুখে। রোগে ধরেছে। লোকের আসা-যাওয়া অনেক কম। প্রায় খালিই পড়ে থাকে' জলসাঘব। বাড়িভাড়াও কিছু কিছু বাকি পড়েছে। ভাবছেন সরে গিয়েও কোথাও আবো ছোট বাড়ি ভাড়া করবেন। চকের আরো ভিতরের দিকে।

সেদিন বাক্স হাতড়ে একটা মুক্তাব মালা বের কবেছিলেন আনোয়াবীবাঈ। ঝুটো নয, খাঁটি মুক্তা। বোম্বাইয়েব আমাব মকবুল আলির উপহার। খুব বড়ো বড়ো জাযগায় যেতে আসতে আনোয়াবীবাঈ গলায় দিতেন। মোতির বিযেতে সেটাই পাঠিয়ে দিলেন।

বিয়েতে মনোহবপ্রসাদ যায় নি, কিন্তু দিন পাঁচেক পবে বিয়েব বিস্তাবিত বিবরণ পড়েছিল খববেব কাগজের পাতায়। খুব ধুমধাম। দু হাজারের ওপর মাননীয় অতিথি। জাঁদরেল সব অভ্যাগতের লিস্ট। সে খবরও মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈকে শুনিযেছিলো। আজকাল কি যে হযেছে আনোয়ারীবাঈয়ের! বোধহয় বযস হয়েছে বলেই,

একটুতেই জল জমা হয় চোখের কোণে। দুটো ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপে, আর ঠিক বুকের বাঁ পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

বিড় বিড় করে বললেন আনোয়ারীবাঈ, একবার মোতিকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। দূর থেকে একটু দেখে আসা।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোন উত্তর দেয়নি। অবশ্য মায়াবতী শকসেনাকে চিঠিপত্র লিখে মোতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো করা যায়, কিন্তু মেয়ে সুখী হয়েছে, ভালো ঘরে, ভালো বরে পড়েছে, এইতো যথেষ্ট। চোখে দেখতে যাওয়া মানেই তো মায়া বাড়ানো। আরো কষ্ট পাওয়া।

মনোহরপ্রসাদ লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল।

তারপর কয়েক বছর আর কোন খোঁজ-খবর নেই। কোন চিঠিপত্রও দেননি মায়াবতী শকসেনা।

মাঝে মাঝে দেখা হলেই আনোয়ারীবাঈ বলেছেন, আর কটা দিনই বা বাঁচব, যাবার আগে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে মোতিকে।

মনোহরপ্রসাদ আমল দেয়নি। বলা যায় না মেয়েমানুষের মন। এমনিতে আনোয়ারীবাঈ খুব শক্ত, বাইরে কাঠিন্যের দুর্ভেদ্য আবরণ, কিন্তু চোখের সামনে নিজের মেয়েকে দেখতে পেলে, সে নির্মোক হয়তো খসে পড়বে। কেঁদে ফেলবেন আনোয়ারীবাঈ। অযথা একটা গোলমালের সৃষ্টি। আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বিরক্ত হবেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ সকালে খবরের কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে মনোহরপ্রসাদের চোখে পড়ে গেল। বার বার পড়ল খবরটা, কাগজটা চোখের কাছ

বরাবর নিয়ে, তারপরই খবরটা নিয়ে গেল আনোয়ারীবাঈয়ের কাছে।

মেজর মোহনচাঁদ বর্মা জলন্ধর থেকে বদলী হয়েছেন লক্ষ্ণৌ। সামনের সোমবার থেকে নতুন জায়গার কার্যভার গ্রহণ করবেন।

আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একেবারে মনোহরপ্রসাদের দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন।

—আমি মোতিকে দেখবো। চুপচাপ দেখে চলে আসব। ওর বাড়ির রাস্তায় বসে থাকব, ও বাইরে বেরোবার সময় একবার শুধু চোখের দেখা দেখব। ভাইসায়েব, এটুকু উপকার আমার করতেই হবে। আমি বুঝতে পারছি, আর আমি বেশিদিন নেই।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারীবাঈ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

—আচ্ছা দেখি। মনোহরপ্রসাদ হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে এল।

বাইরে চলে এল বটে, কিন্তু কথাটা ভুলল না। বিকেলের দিকে টাঙ্গায় চড়ে হাজির হ'ল বাদশাবাগে। বেশি ঘুরতে হল না। রাস্তার ওপরেই খাসা ঝকঝকে দুতলা। বোগেনভিলার গেট, নিচু পাঁচিল আইভি-জড়ান। রাস্তা থেকেই পুরো লন নজরে আসে। বাহারে গাছের ছিটে দেওয়া মখমল-নরম লন।

এগিয়ে গিয়ে তকমা-আঁটা দরোয়ানের সঙ্গেও মনোহরপ্রসাদ আলাপ জমিয়ে ফেলল। মেহ্‌মান আদমি, ঘুরে ঘুরে দেখছে সারা শহর। চমৎকার বাড়ি। যেমন বাড়ি তেমনি বাগান। ভাগ্যবান মালিকটি কে?

—মালিক আডভানি সায়েব, দরোয়ানের ভাগ্যে এমন শ্রোতা সচরাচর জোটে না, টুলে বসে আয়েস করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু

করল, উপস্থিত ভাড়া নিয়েছেন মেজর বর্মা। নতুন এসেছেন এখানে। সামনের রবিবার খানাপিনা আছে। শহরের জাঁদরেল লোকদের আমন্ত্রণ। এখানকার সমাজে পরিচিত হ'তে চান মেজর সায়েব।

—বটে, মনোহরপ্রসাদ কল্পিত বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল, খানা-পিনা হবে কোথায়? কার্লটন হোটেলে?

—উহুঁ, হোটেলে কেন, সাযেব এই লনে বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। বাইরের লনই ত ভাল।

দরোয়ান বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল।

—তাতো নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল মনোহরপ্রসাদ, তারপর একটু থেমে বলল, বিবিজী নেই বাড়িতে, না সায়েব একা।

—হ্যাঁ, বিবিজী আছেন বই কি! জিনিস কিনতে হজরতগঞ্জ গেছেন। বিবিজীই তো সব। তিনিই ঘোরান, সাযেব ঘোরেন।

দরোয়ানের গলা পরিহাস-তরল। মনোহবপ্রসাদ আর কথা বাড়াল না। ধন্যবাদ জানিযে টাঙ্গায এসে উঠল।

ওই কথাই ঠিক হল। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ টাঙ্গা নিয়ে আসবে। আনোযারীবাঈ সঙ্গে যাবেন। নিচু পাঁচিল, রাস্তা থেকে দেখার কোন অসুবিধা নেই। আর তেমন হলে বেড়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেই চলবে। দরোযানের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভিতরে না ঢুকতে দিতে পারে, বেড়ার বাইরে দাঁড়ালে আপত্তি করবে না। খানাপিনার ব্যাপার যখন, লনে আলোর বন্দোবস্ত নিশ্চয় থাকবে। আনোয়ারীবাঈ-এর দেখতে কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক চিনতে পারবেন আত্মজাকে। চোখ ভরেই শুধু নয়, মন ভরেও দেখতে পাবেন।

টাঙ্গায় উঠেই আনোয়ারীবাঈ অস্বস্তি বোধ করলেন। বুকের বাঁ দিকে তীব্র ব্যথা। টনটন করে উঠল চোখের দুটো পাতা।

—কি হলো, কষ্ট হচ্ছে? মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

না, ঘাড় নাড়লেন আনোয়ারীবাঈ, কোন কষ্ট হচ্ছে না। কেবল বুকের ভিতর অসহ্য দাপাদাপি। এত বছর পরে মেয়েকে দেখতে পাবেন, যে মেয়েকে দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন পঙ্কিল পরিবেশ থেকে, বাঈজীর ঘৃণ্য জীবন থেকে উন্নীত করেছেন গৃহস্থ-বধূব পর্যায়ে। তাই বুঝি হৃদয় অধৈর্য হয়ে পড়ছে, অপেক্ষা করতে মন সরছে না।

টাঙ্গা যখন গিয়ে পৌছল তখন অতিথি-অভ্যাগতেরা সবাই এসে গিয়েছেন। জোর বাতির নিচে ঝলমলে রঙীন পোশাকের সার। এতদুর থেকেও প্রসাধনের উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল, মদির সুবাস। কিছু কিছু লোককে মনোহরপ্রসাদ চিনতে পারলো, শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবাব। আমিনাবাদের রিটায়ার্ড জজ কেশরী স্কুল থেকে শুরু কবে নবাবেব বংশধর আমিনউদ্দিন। সেরা ব্যবসায়ী মিস্টার মোডির পাশাপাশি ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হেনরী উড। তাদের সঙ্গে রযেছেন আত্মীয়া আর বান্ধবীর দল। কলরবে জাযগাটা সরগরম। মাঝখানে মেজর বর্মাকে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে তদারক কবছেন, মাঝে মাঝে চোথ ফেরাচ্ছেন বাড়ির দিকে বোধ হয স্ত্রীর আসার প্রত্যাশায়।

দরোয়ানই বলল, মেমসায়েব এখনও নামেন নি, বোধ হয সাজছেন।

আনোযারীবাঈ একদৃষ্টে চেযে রইলেন গাড়ি-বারান্দার দিকে। ঐখান দিয়েই তো মোতি আসবে। আনোয়ারীবাঈয়ের আত্মজা, তাঁরই রক্ত-মাংসে গড়ে তোলা স্বতন্ত্র সত্তা।

হঠাৎ আলোড়ন উঠল অতিথিদের মধ্যে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেন। মেজর বর্মা এগিয়ে এলেন দু-এক পা।

পাতলা ফিনফিনে ব্লাউজ—কটি উদঘাটিনী, হালকা সবুজ রংয়ের আরো পাতলা শাড়ি। অন্তর্বাস দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। আঁকা ভ্রূ, ঠোঁটে কৃত্রিম লালিমা, দু-গালে রুজের রক্তিম আমেজ, সুর্মাটানা দুটি চোখকে আয়ত করার দুর্লভ প্রচেষ্টা, চুড়ো-বাঁধা কটা চুলের রাশ।

চেয়ে চেয়ে দেখলেন আনোয়ারীবাঈ। সেদিনের সে মেয়েটির সামান্যতম পরিচয়ও নেই মিসেস বর্মার মধ্যে। শান্ত সুন্দর মেয়েটা কি মন্ত্রে রূপান্তরিত হল আজকের এই উৎকট বিলাসিনীতে! যে পোশাক পরে আনোয়ারীবাঈ নিভৃতে বিশেষ কোন অতিথির সামনে আসতেও লজ্জা পেতেন, কি ক'রে মোতি হাজার অতিথির মাঝখানে এসে দাঁড়াল সেই পোশাকে!

মিসেস বর্মাকে নিয়ে যেন লোফালুফি শুরু হ'ল। অপূর্ব ভঙ্গীতে মোতি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে সরে সরে যেতে লাগলো। কোথাও কোন পুরুষের চটুল উক্তিতে নিচু হয়ে তার গালে আলতো করাঘাত ক'রে বলল, Naughty boy, আবার কোথাও কোন পুরুষের বাটনহোল থেকে গোলাপ তুলে নিয়ে নিজের কবরীতে গাঁথলো। কারো টেবিলে বসে হেসে গড়িয়ে পড়ল অতিথির গায়ের ওপর, লিপস্টিক-রক্তিম ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মোহিনী হাসি উপহার দিয়ে আবার সরে গেল অন্য টেবিলে।

মনোহরপ্রসাদের টনক নড়লো আচমকা মণিবন্ধে টান পড়তে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর।

টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল, আর দেরি করল না মনোহরপ্রসাদ।

সাবধানে আনোয়ারীবাঈকে ধরে গাড়িতে নিয়ে এল। কি ভাগ্যিস, জোর ব্যাণ্ড শুরু হয়েছে লনে, আনোয়ারীবাঈয়ের উচ্ছ্বসিত কান্নার আওয়াজ কারো কানে যায় নি।

—কি হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ লাগছে? মনোহরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলো।

এতদিন পরে নিজের মেয়েকে চোখের সামনে দেখলে কষ্ট হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। এইজন্য আনতে চায় নি আনোয়ারীবাঈকে।

—না, না, শরীর আমার খুব ভাল আছে। কিন্তু কি হ'ল ভাইসায়েব! বাঈজীর মেয়ে বাঈজীই হ'য়ে রইলো! ছেলেবেলা থেকে কাছ ছাড়া করেও রক্তের দোষ ছাড়াতে পারলাম না। পোশাক-আশাক, রং-ঢং, চালচলন—এ সবে চকের রাস্তায় দাঁড়ানো বাঈজীদেরও যে হার মানালো! এ কি হ'লো ভাইসাব, এ আমার কি হ'ল!

দু-হাতে মুখ ঢেকে আনোযারীবাঈ আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

দ্বিধা

স্কুল ছটায়, কিন্তু মোক্ষদা ওঠে আরো সকালে। প্রায় পাঁচটা নাগাদ। এর আগে অবশ্য আরো ভোর-ভোর উঠত। যখন যোগীন বেঁচে ছিল। কারখানার বাঁশি বাজত ছটায়, তার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে দৌড়তে হত যোগীনকে। পাক্কা আড়াই মাইল রাস্তা এক ঘণ্টায়। এখন আর অত তাড়াতাড়ি নেই। ঝুপসী অন্ধকার থাকতে আর কেউ ডাকে না 'মা' 'মা' বলে। গলার শব্দে ঘুম না ভাঙলে, গায়ে ঠেলা দিয়ে কেউ জাগায় না। আর কেউ ডাকবেও না এ জন্মে। বছর তিনেক হল মোক্ষদার কপাল পুড়েছে। জ্বর নয়, জ্বারি নয়, ভোগান্তিও নয় এমন কিছু। জোয়ান মদ্দ ছেলে, দাড়ি কামাতে গিয়ে একটু কেটে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে মুখ ফুলে গেল। সকালের তাজা স্বাস্থ্যবান ছেলেকে বিকেলে খাটিয়ায় শোয়ানো হল। গাঁদার মালা গলায় জড়িয়ে অন্তিম-যাত্রা।

মোক্ষদার ছেলের ওপর নির্ভর ছিল না। ছেলে বেঁচে থাকতেই তার আলাদা রোজগার ছিল। একলা মানুষের পেট চলার পক্ষে যথেষ্ট। চাকরি সত্যভামা বিদ্যালয়ে। পাড়ার মেয়েদের জড়ো করে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। প্রথম প্রথম গুটি চারেক মেয়ে, তাও বহু কষ্টে। সত্যভামা বিদ্যালয়ের খোদ সেক্রেটারি বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। প্রায় হাতজোড় করে। না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর ইত্যাদি মন-ভুলানো বুকনি। কিছু ভদ্রলোক এতেই ভিজল, কিন্তু অনেকেই

আবার বেঁকে দাঁড়াল। মেয়েছেলের আবার লেখাপড়া! হাতাবেড়ি ছেড়ে রান্নাঘরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরের বারো জনের সামনে দিয়ে মেয়ে হুট হুট করে লেখাপড়া করতে যাবে! শহরে যাই হোক, এই আধা-শহর লোটনপুরে ওসব চলবে না। গালাগালের ছিটেফোঁটা মোক্ষদার বরাতেও জুটত। নিজের ছেলেটাকে খেয়েছে, এবার আশ-পাশের মেয়েগুলোর মাথা খাবে।

দিনকাল বদলাল। একটু একটু করে। টিনের চাল আর মাটির দেয়াল। সত্যভামা বিদ্যালয় পাকা আড়াইতলা হল। ছ জন ছাত্রী থেকে দেড় শো মেয়ে। দু জন মাস্টারনী বেড়ে বেড়ে জনা তেরো।

বয়স হলেও মোক্ষদা এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। দেহের বাঁধন একটু টিলে নয়। চাঁদের আলোয় ছুঁচে সুতো পরাতে সামান্য অসুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে বুকটা কেবল মোচড় দিয়ে ওঠে। জোয়ান চেহারার যোগীনের বয়সী ছেলে পথে-ঘাটে দেখলে হঠাৎ জলের ফোঁটা জমা হয় চোখের কোণে, পা দুটো আচমকা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ঠিক সেই সময় বুকের মাঝখানে দুঃসহ যন্ত্রণা। টনটন করে ওঠে পাঁজরের রাশ। ভেঙে ঝুর ঝুর করে বুঝি গুঁড়িয়ে পড়বে। কিন্তু মোক্ষদা সামলে নেয়। এগিয়ে যাওয়া মেয়েদের ধমক দিয়ে ওঠে, এই, মেয়েছেলে অত লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়োবার কি দরকার? পোড়ারমুখো বাসওয়ালারা চাপা দিতে পারলে তো আর কিছু চায় না। দাঁড়াও, দাঁড়াও সব, আমার কাছে সরে এস।

মোক্ষদা আস্তানাও বদলেছে। আগে থাকত রায়বাড়ির পিছনের একচালায়। মাস গেলে দু টাকা ভাড়া। এখন উঠে এসেছে স্কুল-বাড়িতে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে গোটা চারেক গুমটি। দরোয়ান

বেয়ারাদের জন্য। তারই একটায় মোক্ষদার সংসার। ভাঙা তৈজসপত্র আর সহস্রছিন্ন বিছানা। বেশির ভাগ সময় কাটে স্কুল-বাড়িতে। মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে একতলার সিঁড়ির নীচে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। বড় জোর ঘণ্টাখানেক। তার পরই উঠে বসে। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এদিক থেকে ওদিক। কোথায় মেয়েরা বেড়া পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের ধমক দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কাঁচা পেয়ারা নিয়ে কোথায় চুলোচুলি বেঁধেছে মেয়েতে মেয়েতে, মাঝে পড়ে মোক্ষদা ঝগড়া মেটায়। কাছাকাছি বেয়ারারা না থাকলে দিদি-মণিদের জলও গড়িয়ে দেয়। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা মুচকি হেসে বলে, মোক্ষদাদিদিমণি। সময়ে অসময়ে ঠাট্টাও করে।

অতসী দিদিমণি আজ আসেন নি। ইতিহাসের ক্লাসটা নেবে নাকি তুমি?—খুলে-আসা বেণীটা জড়াতে জড়াতে রমা হাসে। হাতের বইটাও এগিয়ে দেয় কথার সঙ্গে সঙ্গে।

হাঁটুর ওপর রাখা মুখটা তুলে নিয়ে মোক্ষদাও হাসে। কোন উত্তর দেয় না। মাঝে মাঝে স্কুল-বাড়ির জানালার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদে অনেক দূরের গাছপালা কেঁপে কেঁপে ওঠে। লাল ধুলোর ঘূর্ণি। শঙ্খচিলের উদাস কণ্ঠ। ছত্রখান হয়ে যাওয়া একটা সংসারের কথা মোক্ষদার মনে পড়ে। ছেলে আর ছেলের বউ নিয়ে পরিপাটি সংসার। ভিজে ওঠে চোখের দুটো পাতা। দমকা হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরে পড়ার মতন, এমন একটা স্বপ্ন নিঃশেষে মুছে গেল নির্মম এক আঘাতে।

তা হোক। মোক্ষদা চোখ মোছে। এক ছেলে হারিয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় এত মেয়ে ফিরে এসেছে। ওকে 'মা' বলে না হয় নাই ডাকল, মোক্ষদা তো ঠিক মেয়ের মতই মনে করে ওদের। কারুর

জরজারি হলে খোঁজখবর নেয়। বসে বিছানার কাছে। কেউ পড়ে ছড়ে গেলে জলপটি দেওয়া, আইডিন লাগানো—কাজের মোক্ষদার অন্ত থাকে না। এমন কি বছরে একবার বড় দিদিমণির ঘরের সামনে জল-ছলছল চোখে জটলা করে দাঁড়ানো মেয়েদের সান্ত্বনাও দেয়। খনখনে গলায় বলে, অত দুঃখু কিসের? এর পরের বছর ঠিক পাস হয়ে যাবে। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মেয়েছেলে এতদূর পড়েছ, এই না কত!

মেয়ের পাল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই কথাটা মোক্ষদার মনে পড়ে। দিনকাল বদলেছে। সেদিনের আধা-শহর লোটনপুরের বুক চিরে পিচ-ঢালা রাস্তা। কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বসতিও বেড়েছে। শুধু জায়গাই বদলায় নি, মানুষজনও বদলেছে। আগের দিনে পা জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁটত মেয়ের পাল। একটু কোথাও শুকনো পাতা-ঝরার শব্দ হলেই চমকে একেবারে মোক্ষদার গা ঘেঁষে দাঁড়াত। ভয়বিহ্বল চোখে এদিক ওদিক চাইত। কিন্তু এখনকার মেয়েগুলোর ধরন-ধারনই আলাদা। হাওয়ার আগে ছোটে। সামলাতে মোক্ষদার প্রাণান্ত। আলতাপরাক্কবালাই নেই। উঁচু-হিল খটখটে জুতো। পাড়া কাঁপিয়ে চলে। মেয়েরাই কেবল নয়, তাদের বাপ-মাও বদলেছে। আগের দিনে মেয়ের মায়েরা নরম গলায় ডাকত মোক্ষদাকে, ও মেয়ে, দাওয়ায় উঠে বস বাছা। পুঁটু এল বলে। বিকেলে মেয়েদের পৌছে দেবার সময়, এমনি ছাড়ত না। মুড়ি, গুড়, এক ঘটি জল সামনে ধরত: আহা, তেতে-পুড়ে এতটা পথ আসছ, দুটি মুখে দিয়ে নাও। খেতে ইচ্ছা না থাকলেও মোক্ষদা এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারত না। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কোথায় যেন বিনা-সুতোর বাঁধন ছিল। কাছে টেনে আনার প্রয়াস।

আজ কিন্তু এ সবের চিহ্নটুকুও নেই। সবাই ওকে ঝি বলেই ডাকে। ছেলে বুড়ো সকলে। কেউ কেউ তীক্ষ্ণ গলায় 'মুখি ঝি'ও বলে। মেয়েদের ফ্রকে কাদা লাগলে মোক্ষদাকে কথা শুনতে হয়, ফিরতে দেরি হলে রীতিমত গালাগাল। কোন উত্তর দেয় না মোক্ষদা। ঘাড় হেঁট করে চুপচাপ শোনে। দেবার মতন উত্তরও বুঝি ওর নেই। সর্বস্ব সরিয়ে নিয়ে ভগবানই নিরুত্তর করে দিয়েছে ওকে। দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু কেড়ে নিয়েছে।

কিছুদিন আগেও কোন মেয়ের বিয়ে হলে কোমর বেঁধে মোক্ষদা গিয়ে দাঁড়াত। নতুন কাপড় আর পেট পুরে খাওয়াই শুধু নয়, তত্ত্বের জিনিসপত্র নিয়ে আগেভাগে যেত। মেয়ের পাশাপাশি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। দু তরফা খাতির সোহাগ আদর যত্ন।

আজকাল কিন্তু ওর ডাকই পড়ে না। কচি মেয়েদের বিয়ের পাটই উঠে গেছে। ধিঙ্গী সব মেয়ে, নিজেরা দেখে-শুনেই বিয়ে করছে। কোনরকমে শাঁখে ফুঁ দিয়ে দু হাত এক। তত্ত্বের যা ছিরি, কনে নিজে হাতে করেই নিয়ে যেতে পারে। লোকের দরকার হয় না। নিমন্ত্রণের পালাও চুকে গেছে। অরুণার বিয়ের সময় মোক্ষদা মুখ ফুটে বলেই ফেলেছিল, ও অরুণা দিদিমণি, টুকটুকে বর তো হচ্ছে, আমাদের নেমন্তন্ন করে পেট ভরে খাওয়াচ্ছ তো ?

অরুণা মুখ বেঁকিয়েছিল। দু চোখে তাচ্ছিল্যের ঝিলিক : হ্যাঁ, তোমাকে বলব, দরওয়ান-বেয়ারাদের বলব, স্কুলের মেথর-ঝাড়ুদাররাও বাদ যাবে না।

উত্তর শুনে মোক্ষদা আর অপেক্ষা করে নি। পা টিপে টিপে স্কুল-বাড়ির পিছন দিকের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। নীল আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পোরসিলেন ফ্যাক্টরির চিমনি থেকে স্তবকে স্তবকে উঠছে।

একদিন যেখানে সবুজ পত্রের সমারোহ ছিল, বট-অশ্বত্থের জটলা, আজ আর সেদিকে চাইবার উপায় নেই। কারখানার চকচকে ঢেউ-টিনের তেজে চোখ ঝলসে যায়। লোটনপুর বদলেছে, লোটনপুরের মানুষজন বদলেছে। শান্ত সবুজের বদলে অগ্নিক্ষরা রূপ। কোমলবৃত্তির ছিটেফোঁটা কোথাও নেই।

মোক্ষদা নিজের দাওয়ার ওপর উঠে বসে। খুঁটিতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ বসে থাকে। ভুল, ভুল, নিজের বলে পরকে কাছে টেনে আনা যায় না। ফুল ভেবে কাঁটার বোঝাকে বুকে রাখতে গেলে শুধু শরীরই ক্ষতবিক্ষত হয়, হৃদয়ে তৃপ্তি আসে না। নিজের হারিয়ে-যাওয়া ছেলেকে মেয়ের দলেব মধ্যে মোক্ষদা ছড়িযে ছিটিযে দিতে চেযেছিল, বুভুক্ষু মাতৃহৃদযের সান্ত্বনা খুঁজেছিল তাদের মধ্যে; কিন্তু বিশাল সমুদ্রের বারিতে তৃষ্ণা মেটানো যায় না। লবণাক্ত স্বাদে শুধু গলাই জ্বলে ওঠে।

স্কুলের কর্তৃপক্ষরাও কযেকবার কথাটা তুলেছে। মোক্ষদার বয়স হচ্ছে, কমে আসছে চোখের জ্যোতি, বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেযে আনতে কষ্টই হয, কাজে এইবার অবসর নিক। কোন সমস্যা নেই, একলা মানুষ। মাসান্তে স্কুল থেকে না হয় কিছু কিছু দেওযার বন্দোবস্তও করা যাবে।

মোক্ষদা দেযালে হেলান দিয়ে চুপচাপ শুনেছে। প্রথম কযেক মিনিট একটি কথাও বলতে পারে নি, তারপর আচমকা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে একেবারে সেক্রেটারির পা জড়িযে ধরেছে। যোগীনকে মোক্ষদা নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল। সিল্কের পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি। মুখে চন্দনের ফোঁটা। গলায় গাঁদাফুলের মালা। কাজ শেষ করে তার নিমীলিত দুটি চোখে চুমু খেয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।

দাওয়ার পাশে অবাক চোখে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর দিকে চেয়ে বলেছিল, এইবার নিয়ে যাও যোগীনকে। অবিচলিত কণ্ঠ, শুকনো দুটো চোখ। মুখের একটি রেখাও বিশ্বাসঘাতকতা করে নি।

কিন্তু অবসর নেবার কথা হলেই নিজেকে সামলাতে পারে না মোক্ষদা। অবসর নিলেই গোটা স্কুল-বাড়ি মুছে যাবে চোখের সামনে থেকে, এক রাশ মেয়ের পাল সরে যাবে। হাত বাড়িয়ে তাদের নাগাল পাওয়া যাবে না। তার মানেই একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো, যোগীনের জ্বালাময় স্মৃতি বুকে জড়িয়ে। জীবনের ওপর মোক্ষদার খুব লোভ নেই, মরণেও ভয় তেমন নয়। কিন্তু জীবনান্তে যোগীনের নাগাল পাবে, তার কি স্থিরতা।

যোগীনের কাছেই যদি না যাওয়া যায়, তবে মরণে কিসের শান্তি। সব খুইয়ে সেই ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কি সার্থকতা!

মোক্ষদার কান্নায় সেক্রেটারির মন ভেজে। কাজ যখন চালিয়ে যাচ্ছে, তখন থাক্‌ই না হয় একেবারে অথর্ব না হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য আর কিছুদিন পরে মোক্ষদাকে দরকারই হবে না। আজকাল ছোট ছোট মেয়েরাও একলা একলাই স্কুলে চলে আসে—সাবধানে পথ পেরিয়ে, এদিক ওদিক দেখে। একটু যারা দূরে থাকে, তারা বাসে চড়ে স্কুলের গেটে পৌঁছে যায়। নতুন বাস চালু হয়েছে। মনসাতলা, বুড়োশিবপুর থেকে লোটনপুর ছুঁয়ে সোজা আনন্দগঞ্জ। তা ছাড়া সব বাড়িতেই বেকার দাদা কিংবা কাকা মজুত। তারাই হাত ধরে স্কুলে নিয়ে আসে বোন-ভাইঝিদের। এর জন্য বাড়তি পয়সা খরচ করতে চায় না।

এ কথা মোক্ষদাও বুঝতে পারে। আজ বাদে কাল তাকে আর দরকার হবে না। কিন্তু এ সব কথা তার ভাবতে ভাল লাগে না। মেয়ে নিয়ে আসার কাজ চলে গেলেও স্কুল-বাড়ি সে ছাড়বে না।

সেক্রেটাবিব হাতে পাযে ধবে অন্য কাজ নেবে। ঘব-দোব ধোয়া-মোছা, দিদিমণিদেব ফাইফবমাস খাটা, দবকাব হলে স্কুলেব মাঠ ঝাঁট দেওযা। তবু মোক্ষদা সত্যভামা বিদ্যালয ছাডতে পাববে না।

সকাল থেকেই মোক্ষদাব মাথাটা টনটন কবছিল, সন্ধ্যাব সঙ্গে সঙ্গেই দপদপ কবে উঠল কপালেব দুটো পাশ। গা বেশ গবম। কাঁপতে কাঁপতে ঘবেব কোণে গিযে শুযে পডল আঁচল বিছিযে। তাবপব দুটো দিন দুটো বাত কেটে গেল। মাঝে মাঝে ক্লান্ত দুটো চোখ মেলে মোক্ষদা চেযে দেখেছে। অস্পষ্ট দু-একটা মানুষেব কাঠামো। কপালে জলপটি। কে যেন ওষুধও মুখে ঢেলে দিল। সাবধানে গাযে চাপা দিযে দিল। সন্তর্পণে মাথাটা তুলে দিল বালিশেব ওপব।

মোক্ষদাব জ্বব ছাডল তিন দিনেব পব। দুবল পাযে দেযাল ধবে ধবে বাইবে গিযে বসল। চোখেব সামনে চাপ চাপ অন্ধকাব। কাঁপছে আঙুলেব ডগাগুলো।

কেমন আছ গো?—স্কুলেব দবোযান বামদীন সামনে এসে দাডাল।

ভাল। —মোক্ষদা কাঁপা গলায উত্তব দিল। তাবপব একটু থেমে বলল, বড্ড খিদে পেযেছে। এ কদিন পেটে তো কিছু পডেনি।

কেন পডবে না? —বামদীন হাসল। আমিই তো বাটি বাটি বার্লি কবে খাইযেছি।

তুমি?

হ্যাঁ, আমি আব বেণীপ্রসাদ। ডাক্তাবেব দাওযাই এনেছি, মাথায জলপটি লাগিয়েছি। কম সেবা কবেছি তোমাব।—বামদীন হাসি থামাল না।

এবা সেবা কবেছে। মোক্ষদা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে আবম্ভ কবল।

জ্বরের প্রকোপের সময় চোখ তুলে এদেরই বুঝি দেখেছিল। সেবাযত্ন করেছিল, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা। সব কিছু। বুক কাঁপিয়ে মোক্ষদা নিশ্বাস ফেলল। দিদিমণিরা কেউ আসে নি! ছাত্রীরাও একবার এসে দাঁড়ায় নি দরজার কাছে!

বিড় বিড় করে মোক্ষদা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করল, দিদিমণিরা কেউ আসে নি? স্কুলের মেয়েরা?

রামদীন ঘাড় নাড়ল: বড় দিদিমণি মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতেন। এসে দাঁড়াতেন চৌকাঠের কাছে। কিন্তু খুকীরা কেউ আসে নি।

কেউ না! মোক্ষদার চোখের পাতা ভিজে উঠল। বুকের ঠিক মাঝখানে মোচড় দেওয়ার মতন যন্ত্রণা। সব পালটে গেছে। পৃথিবীর নিয়মকানুন, মানুষের মনমেজাজ সব। অনেক আগে আর একবার অসুখে পড়েছিল মোক্ষদা। এমন জ্বর নয়, এতদিন শুয়েও থাকতে হয় নি। একদিনেই আরাম হয়ে গিয়েছিল। দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়ের দল। স্কুলের এক দরোয়ানের ওপর সেদিন মেয়েদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার পড়েছিল। ঘোষালদের রাধারাণী তো কেঁদেই আকুল। কে তাকে বুঝি বলেছিল, মোক্ষদা আর বাঁচবে না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মোক্ষদা ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

কথাটা মোক্ষদা মেয়েদের জিজ্ঞাসাও করেছিল, হ্যা গা মেয়েরা, এই যে কদিন বিছানায় শুয়ে রইলাম, মরেছি কি বেঁচেছি একবার খোঁজও তো নিতে যাও নি!

অন্য মেয়েরা কোন উত্তর দিল না। বিব্রত ভাব মুখে চোখে, ছলছুতো করে পাশ কাটিয়ে গেল। কিন্তু উত্তর দিল রিনি। চটপটে চৌকস মেয়ে। চোখে মুখে কথা। ব্যারিস্টার বাপের আদরের দুলালী।

হ্যাঁ, যাব বইকি খোঁজ নিতে! চারদিকে যা সব অসুখ শুরু হয়েছে, এই সময়ে রোগীর ঘরে গিয়ে ছোঁয়ালেপা করতে আছে! বুড়ো হয়ে মরতে বসেছ, এখনও বুদ্ধি হল না।

মোক্ষদা রাস্তার গ্যাসপোস্ট ধরে টাল সামলাল। এতদিন ভুলই করেছে। হারানো যোগীনের বেদনা ভুলতে গিয়ে বৃথাই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছে এই সব মেয়েদের। পর বুঝি কোনদিনই আপন হয় না। আর একটা কথা মনে পড়তেই মোক্ষদা বলতে বলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলা যায় না। আজ যোগীন থাকলে সেও হয়তো এইভাবেই উত্তর দিত। যুগের হাওয়া বদলেছে, যোগীনও বদলাত। যোগীনের বিয়ে হলে তার কচি বউও এমনি সুরেই কথা বলত। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে সরে দাঁড়াত পায়ে পায়ে।

সেদিন ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল। স্কুলে উৎসব ছিল। সেজে-গুজে এক পাল মেয়ে এসে জুটল। দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি সামলাতে মোক্ষদা নাজেহাল। কেউ কেউ আবার সঙ্গে করে ছোট ভাইবোনদেরও এনেছে। সব মোক্ষদার জিম্মায়। উৎসব শেষ হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মেয়েদের জড়ো করে মোক্ষদা যখন পথে পা দিল, তখন বেশ অন্ধকার।

বিবিদের বাড়ি এক কোণে। ঘিঞ্জি বস্তি, এবড়ো-খেবড়ো মাঠ পার হয়ে অনেকটা পথ। বিবি চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই তার মায়ের নজরে পড়ল। প্রথমে চোখ কুঁচকে দেখলেন, তারপর বিবিকে টানতে টানতে আলোর নীচে নিয়ে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ রে, হার কই তোর? নতুন হার?

আওয়াজে বাড়ির আর সকলে কাতার দিয়ে দাঁড়াল।

মোক্ষদা সবে চৌকাঠ পার হয়ে রাস্তায় পা দিচ্ছিল, এমন সময় তার ডাক পড়ল।

হ্যাঁ গা বাছা, হনহন করে তো পথে পা বাড়াচ্ছ! মেয়ের হার গেল কোথায়? আনকোরা নতুন হার, আজ সবে গলায় পরেছে!

কোমরে হাত দিয়ে মোক্ষদা আস্তে আস্তে ফিরে এসে দাঁড়াল: হার!

হ্যাগো বাছা! আকাশ থেকে পড়লে যে! হার গেল কোথায়?

মোক্ষদা আমতা আমতা করল: হার? হার ছিল গলায়?

ছিল না তো কি আমরা মিছে কথা বলছি?

মনে পড়ল মোক্ষদার, উৎসব শুরু হবার আগে বিবি, মালতী আর ঘোষালদের কালো মেয়েটা হুটোপাটি করছিল স্কুলের উঠানে, সিঁড়ি দিয়েও কম ছুটোছুটি করে নি। দু-একবার দিদিমণিদের বকুনিও খেয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার হৈ-চৈ আরম্ভ করেছিল। কথা শোনে নি। সেই সময়ই হয়তো গলা থেকে হারটা খুলে পড়ে গিয়েছে। তাই যদি হয়, তবে সে হার পাওয়া মুশকিল। উটকো লোকের আমদানি বড় কম হয় নি স্কুলে, কোথা দিয়ে কে তুলে নেবে টের পাওয়া দায়।

মোক্ষদা খুব নিচু গলায় বলল—চিবিয়ে চিবিয়ে: যা দুরন্ত মেয়ে, সারাক্ষণ হুড়োহুড়ি করছিল, কোথায় বোধ হয় খুলে পড়ে গিয়েছে।

বিবির মা রুখে দাঁড়ালেন: কচি মেয়ে একটু দুরন্তই হয়। ওরা এই বয়সে দৌড়ঝাঁপ করবে না তো আশি বছরের বুড়ীরা লাফালাফি করবে? তা বলে গা থেকে গয়না খুলে পড়বে আর তোমরা সব চোখ বুজে বসে থাকবে? মাস গেলে এত টাকা ঢালা হয় মেয়ের পিছনে, তুমিও অমনি কাজ কর না, সোনার জিনিস এমনি খোয়া গেলেই হল? আমি অল্পে ছাড়ছি না। স্কুলের সেক্রেটারিকে লিখব। এ সব অপদার্থ লোকের হাতে দিনের পর দিন মেয়েকে ছেড়ে দেওয়াই তো বিপদ!

পাশ থেকে আর একটি মহিলা কথা বললেন। এ বাড়িতে নতুন

আমদানি। এর আগে তাকে দেখে নি মোক্ষদা : তুমিও যেমন দিদি, হার অমনি গলা থেকে খুলে গেল! যা বোঝাচ্ছে, তুমি সরল মানুষ, তাই বুঝছ। আমার মিলির সোনার ক্লিপ হারিয়েছিল পার্কে। গিয়ে মালীকে আচ্ছা করে ধমক লাগালাম। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করে না। কোথায় পড়ে গেছে। পুলিসের ভয় দেখাতে তখন চুপ। দু দিন পরে সোনার ক্লিপ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

মোক্ষদার সামনে কালো আস্তরণ নেমে এল। সামনে একরাশ কঠিন মুখের সার। কানের পাশে হাজার মৌমাছির অশ্রান্ত গুঞ্জন। একটি কথাও না বলে পা টিপে টিপে বাইরে চলে এল।

কি ভাবে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে স্কুল-বাড়ির দরজায় মোক্ষদা এসে পৌঁছল, তার নিজেরই খেয়াল নেই। অল্পে ছাড়বে না বিবির মা। এই নিয়ে রসাতল করবে।

স্কুল-বাড়ির মধ্যে ঢুকে মোক্ষদা চোখ কুঁচকে এদিক ওদিক দেখল। যদি কোথাও চিকচিক করে ওঠে কিছু। হার নয়, যেন হারানো সম্মানই মোক্ষদা খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল। মাঠ দালান সিঁড়ি। ক্লাস-রুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, নয়তো সেখানেও চোখ বোলাত।

সারাটা রাত মোক্ষদা ছটফট করল। নিজের মনকে বোঝাল অনেক করে। হার হারানোর জন্য মোক্ষদা কেন দায়ী হবে? গয়নাগাটি দিয়ে সাজিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোই বা কেন? কিন্তু বৃথা। বুকের মাঝখানে কাঁটা। এপাশ ওপাশ করতে গেলেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা।

খুব ভোরে মোক্ষদা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। সারা রাত এক মিনিটের জন্যও চোখ বন্ধ করে নি। ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে পড়ছে। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে মোক্ষদা স্কুল-বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। ক্লাসের

দরজা খোলা। একটু পরেই ঝাড়ুদার ঝাঁট দিতে আসবে। মোক্ষদা একটা একটা করে সমস্ত ক্লাস ঘুরল। এখানে ওখানে ব্লটিংয়ের টুকরো, কাগজে মোড়া আমলকী, একটা কোণে মেয়েদের মাথার রিবনের কিছুটা। হাঁটুতে হাত দিয়ে মোক্ষদা সিঁড়িতে বসে পড়ল। আজ বিবিদের বাড়িতে যাওয়াই মুশকিল। গালাগালিতে কান পাতা দায় হবে। বিবির বাবা হয়তো নিজে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে আসবেন। সোজা ঢুকবেন সেক্রেটারির ঘরে। তারপর মোক্ষদার ডাক পড়বে। গাফিলতি বই কি, একশো বার গাফিলতি। কড়ামেজাজী সেক্রেটারি কোন কৈফিয়তই শুনবেন না। জবাব হয়ে যাবে মোক্ষদার। স্কুল ছাড়তে হবে মোক্ষদাকে—সে দুঃখ তো রয়েইছে, তার ওপর এমন একটা বদনাম নিয়ে যেতে হবে, এই চিন্তাই পাগল করে তুলল মোক্ষদাকে।

চোখ মুছে নেমে আসবার মুখেই মোক্ষদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক সিঁড়ির চাতালের পাশে হারের টুকরো। সকালের আলোয় চকচক করছে। ঝুঁকে পড়ে মোক্ষদা তুলে নিল। এক ভরির হার, হালকা প্যাটার্ন। এমন কিছু দামী নয়। কিন্তু হার তো নয়, যেন উদ্যত নাগ। এরই ছোবলে সারা শরীর মোক্ষদার নীল হয়ে গিয়েছিল। মোক্ষদা আঁচলে বেশ ভাল করে গিঁট দিয়ে নিল। কোন রকমে যেন ফসকে আবার অদৃশ্য না হয়ে যায়। হারটা সোজা ছুঁড়ে দেবে বিবির মায়ের নাকের সামনে। মানুষকে এমনি সন্দেহ করলেই হল। অসাবধানী মেয়ে, কোথায় ফেলে আসবে হার, আর দোষ হবে মোক্ষদার। হায় রে, তবু যদি আগেকার মত চার-পাঁচ ভরির বিছে হার হত, কিংবা ভারী ওজনের মফ-চেন। সোনা চিকচিক এই তো চেহারা হারের, এটা চোখের আড়াল হতেই এত তর্জন।

মোক্ষদা বেরিয়ে পড়ল। ভোরে উঠে রান্না সেরে নেয়, তারপর দু মুঠো মুখে দিয়ে মেয়েদের বাড়ির দিকে পা চালায়, কিন্তু আজ আর অপেক্ষা করতে মন সরল না। কি জানি ভোর ভোর বিবির বাপ যদি সেক্রেটারির বাড়ি গিয়েই হাজির হন! এক ভারি সোনার জিনিসে শোক কম না কি! মোক্ষদার মতন বিবির মাও হয়তো সারাটা রাত এপাশ ওপাশ করেছেন। ঘুম আসে নি চোখে।

স্পষ্ট করে মোক্ষদা আজ বলবে। কত বছর ধরে মেয়েদের নিয়ে আনাগোনা করছে, কোনদিন কারুর গা থেকে একটু রাংতাও খোয়া যায় নি। একটু উঁচু স্বরে কেউ কোনদিন মোক্ষদাকে কথা শোনাতে পারে নি।

বিবিদের বাড়ির কাছ বরাবর এসে মোক্ষদা আঁচলটা টিপে টিপে দেখল। না, ঠিক আছে। কোন রকমে হারছড়া ফেলে দিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে মোক্ষদা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এক পা এগিয়েই কথাটা মোক্ষদার মনে হল। আগে হলে এমন একটা কথা মনেও আসত না। কিন্তু দিনকাল বদলেছে, মানুষজনও। আধা-শহর লোটনপুর আজ পুরো শহর। সবুজ মাঠের বুক চিরে নির্মম পিচের সড়ক। আম-জাম-জামরুল-বন মুছে ফেলে কলকারখানার পত্তন হয়েছে। ঢেউটিনের শেড আর কালো কালো বিরাট চিমনি। নীল আকাশের বুকে অনবরত কালি ছিটোচ্ছে। সেই সঙ্গে মানুষের মনও কালো করে তুলছে সন্দেহের বিষে।

যে অপবাদ মোক্ষদা এড়াবার চেষ্টা করছে, এ হার নিয়ে হাজির হলে সে অপবাদের বোঝা আর কোনদিনই যে নামাতে পারবে না ঘাড় থেকে। হাজার মুছলেও বদনামের পাঁক মুছে ফেলতে পারবে না।

সবাই বুঝবে, আগের দিন ধমক খেয়ে প্যাটরা থেকে মোক্ষদা

হারছড়া বের করে এনেছে। পুলিসের ভয়ে, চাকরি যাবার ভয়ে, বামালসুদ্ধ পৌছে দিচ্ছে বাড়ি বয়ে। সত্যি কথাটা কেউ শুনতে চাইবে না। বিশ্বাসও করবে না। সেদিনের সেই পার্কের মালীর সঙ্গে আজকের মোক্ষদার কোন প্রভেদ থাকবে না।

আঁচলের গিঁট খুলে মোক্ষদা হারছড়া নিজের মুঠোর মধ্যে নিল। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাতের মুঠোও। ভয় হল মোক্ষদার, কি জানি ছিটকে যদি আবার পড়ে যায় হারছড়া! পথের পাশের নালার মধ্যে নিখোঁজ হয়!

ক্ষতি কি! তা হলে তো ভালই হয়। আজকের অবিশ্বাসী মানুষের কাছে গিয়ে আর তাকে দাঁড়াতে হয় না। নিজের সাফাই গাইতে হয় না। এ যুগের কষ্টিপাথরে আগের যুগের এক মনকে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করার প্রয়োজনই হয় না।

কিন্তু তা কি পারবে মোক্ষদা! ওর এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা সুনাম, এই স্বল্পভরির অলঙ্কারের ঘায়ে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হতে দেবে না। মুঠোর মধ্যে হার নয় যেন আগের দিনের বিশ্বাস আর কর্তব্যজ্ঞানই মোক্ষদা বয়ে নিয়ে চলেছে। ওর অপবাদ স্খালনের চেষ্টা নয়, আজকের দিনের সন্দেহ-জীর্ণ মানুষের মনকে যাচাই করার প্রয়াস।

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মোক্ষদা কাটিয়ে উঠল।

বিস্মৃতি

পিনাকীপ্রসাদ বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দু চোখে অনিদ্রার ছাপ, মুখে বিরক্তি। সারা রাত ঘুমোতে পারেন নি। কেবল এপাশ ওপাশ করেছেন। রাত দুটো পর্যন্ত চেয়ারে বসেছিলেন, টেলিফোনের সামনে। বম্বে থেকে একটা দরকারি খবর আসার কথা। তুলোর বাজারের গোপনতম খবর। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ইজিপ্সিয়ান তুলোর দরের বিস্ময়কর ওঠানামা শুরু হবে, তারই হদিশ। বসে বসে পিনাকীপ্রসাদের কোমর ব্যথা, বার বার চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে, কিন্তু টেলিফোনের তারে সামান্য স্পন্দন নয়, শেয়ার বাজারের একটু আভাসও না।

মুখে চোখে জল দিতে দিতে পিনাকীপ্রসাদ ঠিক করলেন অফিসে গিয়েই টেলিগ্রাম করবেন। সাগরমল কোঠারির ফার্মের নামে জরুরী তার। উত্তর না আসা পর্যন্ত চিত্তস্থির হবে না। রাত দুটোর পর থেকে ভোর পর্যন্ত একটু চোখ বুজোতে পারেন নি। আকোলা থেকে খবর এসেছে এবার তুলোর অবস্থা খারাপ। পঙ্গপালের অত্যাচারে মাঠের তুলো ঘরে আর ওঠে নি। অথচ বেশ কয়েক হাজার মণ তুলো যোগান দেবার কথা। গোটা তিনেক জমকালো কাপড়ের মিল ওঁর আশায় থাকবে। পিনাকীপ্রসাদ মতলবও একটা ঠিক করে রেখেছেন। আকোলায় না সুবিধে হয়, লায়ালপুর রয়েছে, রয়েছে পূর্ব পাঞ্জাবের সুবিস্তীর্ণ তুলোর ক্ষেত। সময় সুযোগ করে লোক পাঠাতে হবে। চাষীদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত। প্রয়োজনমত তুলো কিনে যাতে সোজা চালান দেওয়া যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পিনাকীপ্রসাদ তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। ভোর থেকে মাথাটা টিপ টিপ করছিল, কপালের দুপাশের শিরার অসহ্য দপদপানি, চা ঠোঁটে ঠেকিয়ে বেশ আরাম বোধ করলেন। হাজার চিন্তা, অসংখ্য ঝামেলা। সারা ভারতবর্ষে ব্যবসার সুতো ছড়ানো। একদিকে টান পড়লে অন্যদিকে ঢিলে দিতে হয়। একটা মন্দা তো আর একটা যাতে তেজী থাকে তার জন্য প্রাণপণ খাটুনী। ভারসাম্য রাখার চেষ্টা। তুলো, তিসি, শাল, জিপসাম, ব্যবসার দাবার ছকে একাধিক পাকা ঘুঁটি, এছাড়া ছোটখাটো অর্ডার তো আছেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ঘুঁটিগুলো নাড়াচাড়া করেও পিনাকীপ্রসাদ গভীর আনন্দ পান।

পায়ের শব্দে পিনাকীপ্রসাদ মুখ তুলে চাইলেন। পুরানো চাকর রামলাল এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে খানচারেক খবরের কাগজ। চায়ের টেবিলে পিনাকীপ্রসাদ কাগজগুলো মেলে ধরলেন। প্রথম কয়েকটা পাতা তাড়াতাড়ি উল্টে গেলেন। রাজনৈতিক ছেলেখেলায় তাঁর আকর্ষণ কম, দেশবিদেশের খবরাখবরেও স্পৃহা নেই। বিশেষ একটি পাতা খুলে বসলেন। শেয়ার মার্কেটের পাতা। চশমাটা হাত দিয়ে ঠিক ক'রে পিনাকীপ্রসাদ ঝুঁকে পড়লেন। সারাটা পাতায় কেমন একটা ঝিমিয়ে পড়া ভাব। মরফিয়া দেওয়া রোগীর মতন শেয়ারগুলো যেন নিস্তেজ, নির্জীব। একটু নড়াচড়া নেই, ওঠানামা নয়, এক সপ্তাহ ধ'রে এমনি চলেছে।

ঘড়িতে আটটা বাজতেই পিনাকীপ্রসাদ চমকে সোজা হ'য়ে বসলেন। দরকারি কাজ আছে অফিসে। নটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে জামা কাপড় পরতে গিয়েই কথাটা মনে পড়ে গেল। আজ আর কোট প্যান্ট নয়, পানমল জেঠিয়ার সঙ্গে দেখা করার

কথা। পাটের গদীতে। ওসব জায়গায় শেরওয়ানী আর ধুতি পরে যাওয়াই সমীচীন। ফরাসে 'গা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসার পক্ষে প্যাণ্টে অসুবিধা অনেক। তাছাড়া যে জায়গায় যে আচার। উড স্ট্রীটে যা চলে উডমণ্ট স্ট্রীটে তা চলবার কথা নয়।

পিনাকীপ্রসাদ এ কোণের আলমারীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। লম্বা কোট একটা বছর দুয়েক আগে করিয়েছিলেন, বম্বে যাবার আগে। দরকার হয না বলে সেটা এ আলমারীর মধ্যেই রেখেছিলেন। পাল্লাটা খুলেই অবাক হলেন। রাজ্যের জামাকাপড় ঠাসা। থাকে থাকে সাজানো শাড়ি, এর মধ্যে শেরওয়ানী উদ্ধার করা সমুদ্রে রত্ন আহরণ করার চেয়েও দুরূহ। দু একটা শাড়ি সরাতেই ঠক ক'রে মেঝেয় পড়ল। পিনাকীপ্রসাদ নিচু হ'যে কুড়িযে নিলেন। একটি মেয়ের ফটো। কিশোরী। এক মাথা কুঞ্চিত চুলের রাশ। আযত দুটি চোখ, বাঁকা হাসিতে অপরূপ অধরের গড়ন। গিরিবালার ছবি। পিনাকীপ্রসাদের স্ত্রী গিরিবালা। এ ফটো বিযের কিছুদিন পরেই তোলা। পিনাকীপ্রসাদের বেশ মনে পড়ল, ফটোগ্রাফারকে বাড়িতে ডেকে তোলানো হ'য়েছিল। একলা ফটো তুলতে গিরিবালা কিছুতেই রাজী হয নি, পিনাকীপ্রসাদ বহু সাধ্য-সাধনা করে রাজী করিয়েছিলেন। এর বছর তিনেকের মধ্যেই গিরিবালা মারা গিযেছিল। হার্টে বাত। একেবারে আচমকা মৃত্যু। অফিসে খবর পেযে পিনাকীপ্রসাদ হন্তদন্ত হ'সে ছুটে এসেছিলেন। কিছুদিন বড় ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া একটা মানুষকে খুঁজেছিলেন, তারপর ছোটনাগপুর থেকে জরুরী তার পেয়ে শহরের বাইরে চলে গিযেছিলেন। বিরাট শালের বন ইজারা নিযে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন। মোটা টাকার কণ্ট্রাক্ট। ঝক্কিও কম নয়। বেছে বেছে গাছ চেরাই, লরীতে

চাপিয়ে কাঠের বোঝা বিশ মাইল দূরের স্টেশনে নিয়ে আসা, সেখান থেকে আবার মালগাড়িতে চড়িয়ে বড় শহরে। একটু অবসর ছিল না পিনাকীপ্রসাদের। সেই গহন অরণ্যানীর নিবিড় অন্ধকারে একসময়ে গিরিবালার মুখ অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। সাব-কণ্ট্রাক্টরদের বিলিব্যবস্থা করার ব্যস্ততার মধ্যে নিজের জীবন নিশ্চিহ্ন। কেবল মাঝে মাঝে শালের মঞ্জরীর দিকে চোখ পড়লে পিনাকীপ্রসাদ একটু উদাস হয়ে পড়তেন। লাল শাড়ির অস্পষ্ট আভাস, আরক্তিম দুটি গণ্ডের ছবি মনের পটে ভেসে উঠেই নিমিষে মিলিয়ে যেত।

গিরিবালার সঙ্গে পিনাকীপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান অল্প নয়। গিরিবালা যখন কৈশোর যৌবনের-সন্ধিতে, পিনাকীপ্রসাদ তখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। অবশ্য বিয়ের বয়স পিনাকীপ্রসাদ পার হন নি। শক্ত নিটোল চেহারা, চুলের রং বায়সলাঞ্ছিত। কপালে, গালে বয়সের সামান্য রেখাও নয়। আসল কথা দ্বিতীয়বার বিয়ের তাগিদ দেবার মতন বাড়িতে কেউ মজুত ছিলেন না। সাত বছর বয়সে মা চোখ বুজেছেন, সতেরোয় বাপ। মামার বাড়িতে মানুষ। এখন তিনকুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের দু একজন পুরোনো সুবাদ ঝালিয়ে নিতে এসেছিলেন, ছেঁড়া সুতোয় গেট দেওয়া, কিন্তু সুবিধা হয় নি। পিনাকীপ্রসাদের নিস্পৃহতা আর উপেক্ষার দেয়ালে মাথা ঠুকে সবাই সরে গিয়েছে।

পিনাকীপ্রসাদ নিজেও আর বিয়ের কথা ভাবতে সময় পান নি। শাল বন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপরই দুটো বড় বড় ব্যবসার পত্তনের ব্যাপার। ধামগড় কোলিয়ারি মিত্র কোম্পানীর হাত ছাড়ো ছাড়ো অবস্থা। বাপ-বেটায় মামলা। পিনাকীপ্রসাদ লোক লাগিয়েছিলেন। খোঁজ-খবরও নিয়েছিলেন তলায় তলায়। কয়লা তো নয়—সোনা! দুদিনে রাজা করে দেবে মানুষকে। কিন্তু পিনাকীপ্রসাদের বরাতে

শিকে ছেঁড়েনি। মোহনচাঁদ শাকসেনা মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে নিল দখলিয়ানা স্বত্ব। আর একটা ব্যবসা অভ্রের। সেখানেও, ডাঙ্গায় তোলার মুখে বঁড়শি ছিড়ে মাছ গভীর জলে। মুখের গ্রাস পার্শী সাহেব সলোমন কেড়ে নিলেন। পিনাকীপ্রসাদ নিজের কোষ্ঠীটা কাশীতে কুলাচার্য রেবতীমোহন সাংখ্যতীর্থ জ্যোতিষরত্নের কাছে পাঠিয়েছিলেন। দিন দশেকের মধ্যেই তাঁর নির্দেশ এল। গোমেধ বর্জন করে পলা ধারণ। খনিজ পদার্থের ধারে-কাছে নয়। তখন পিনাকীপ্রসাদ কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তুলো আর তিসি নিয়ে মেতেছিলেন, ফাঁকে ফাঁকে পাট আর লোহালক্কড়ের দালালী। আজ অবশ্য কোষ্ঠীর ফলাফলে তেমন বিশ্বাস নেই। জিপসামে ফেঁপে উঠেছেন, কয়লার ঝড়তি পড়তি দু-একটা অর্ডারেও মন্দ নয়, আসল কথা বরাত ফিরে গেছে। মুঠো ক'রে ধুলো তুললেও, ধুলো সোনায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

জীবনে অবসর ছিল না পিনাকীপ্রসাদের, সেইজন্য অবসর-সঙ্গিনীর কথা মনে হয় নি। আজ এত বছর পরে বিস্মৃতির শ্যাওলা সরিয়ে মনের সায়রে ঢলঢলে মুখ ভেসে উঠল। অন্যদিন মোটরে বসে পিনাকীপ্রসাদ দরকারী ফাইলপত্র নাড়াচাড়া করেন। রামলাল শিউকুমারের বাড়তি লোহার অর্ডার কিংবা প্রেসটন কোম্পানীর মিহি সুতোর কোটেশন। কিন্তু আজ চুপচাপ বসে রইলেন দু হাঁটুতে দু হাত রেখে। রাস্তার দু ধারে গাছের সার। ডালে ডালে কচি পাতার ইশারা। পার্কের রেলিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে রঙিন ফুলের বাহার। মাসের হিসাব পিনাকীপ্রসাদকে রাখতে হয়, অন্ততঃ দুটো মাসের। যে মাসে তিসি বোনা হয় আর যে মাসে তুলোর ক্ষেতে মজুররা ফসল তুলতে নামে। আজ কিন্তু নতুন ক'রে মনে পড়ল, শীত শেষ, বসন্ত শুরু। এমনি এক মাসেই পিনাকী-

প্রসাদ মাথায টোপব চড়িযে ববেব সাজে মোটবে উঠেছিলেন। নিজেব পছন্দ কবা মেযে। জুটমিলেব ম্যানেজাবেব সঙ্গে পাট যোগান দেবাব একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'বে ফিবছিলেন, পথে মোটবেব ইঞ্জিন বিগডালো। নেমে পিনাকীপ্রসাদ পাযচাবী কবছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলেই অবাক। পাশেব কববীগাছেব সঙ্গে মেযেটাব কোথায মিল বযেছে। সতেজ প্রশাখা, পাতাব অফুবন্ত সমাবোহ, পুষ্পেব স্তবক। শহবেব মেযে পিনাকীপ্রসাদ কম দেখেন নি। পত্রবর্জিত বিক্তসম্ভাব বিটপীব সামিল। না রূপ, না বস। বাডিব চৌকাঠ পেবিযে অফিসেব চৌকাঠ ডিঙ্গোবাব প্রয়াস। এ মেযেব কিন্তু জাত গোত্র দুই যেন আলাদা। তুলো, তিসি, জিপসামে হাবিযে যাওযা মন থমকে দাঁডিযেছিল।

পাটকলেব ম্যানেজাবেব সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত কবাব মতন মেযেব বাপেব সঙ্গেও পাকাপাকি বন্দোবস্ত কবে ফিবেছিলেন। মেযেব বাপ ছাপোষা কেবানী। গ্রামেব পোস্ট অফিসেব মাঝাবি কেবানী। সব শুনে মূর্ছা যাবাব দাখিল। গিবিবালা বাজবাণী হবে—এ স্বপ্নেও ভাবেন নি।

বিযেব পবে গিবিবালাকে পিনাকীপ্রসাদ আব বাপেব বাডি পাঠান নি। বাব দুযেক বাপ এসেছিল, কিন্তু বাডিঘব, জামাযেব হালচাল দেখে বেশি আসা-যাওযা কবতে সাহস পান নি। মেযে সুখে থাক—এই কামনাটুকু কবে গ্রামে ফিবে গিযেছিলেন।

গ্রামেব আবহাওযায গাছপালাব পটভূমিতে গিবিবালাকে যতটা ভাল লেগেছিল, শহবেব সাজানো গোছানো পবিবেশে তেমন যেন আব চোখে লাগল না। এ মেযে শেযাববাজাব বোঝে না, তুলো, তিসি, পাট, জিপসামে আনন্দ পায না একটুও। কোন পার্টিতে আমন্ত্রণ এলে জল-

ছলছল চোখে পিনাকীপ্রসাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। সেজেগুজে অত লোকের সামনে বসে কিছুতেই খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে না, আলো ঝলমল হোটেলে কিংবা কারুর সাজানো ডাইনিংরুমে। শরীর খুব খারাপ —এই কথাই যেন পিনাকীপ্রসাদ বুঝিয়ে বলেন।

পিনাকীপ্রসাদ কথা বাড়ান নি। নিজেই মোটরে গিয়ে উঠেছিলেন।

তবু গিরিবালা যেন বাড়ির অনেকখানিই জুড়ে ছিল। নিজে কোথাও খেত না বটে, মানুষকে খাইয়ে কিন্তু অদ্ভুত আনন্দ পেত। মনে আছে পিনাকীপ্রসাদের, গোটা সাত আট বাটি খাবার থালা ঘিরে থাকত। ছেঁচকি, ঘণ্ট, ডালই তিনরকম।

—সনাতনকে বল তো তোমায় চপ কাটলেট তৈরি করা শিখিয়ে দেবে। গিরিবালা ঘাড় নেড়েছে, দরকার নেই আমার ওসব শিখে। তার চেয়ে কাল তোমায় পলতার বড়া ক'রে দেব দেখবে, বুঝতেই পারবে না।

আস্তে আস্তে পিনাকীপ্রসাদ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বেশির ভাগ রাত্রেই বাইরে খেয়ে আসতেন। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরের ঘরে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতেন। নতুন নতুন ব্যবসার স্কিম, পুরোনো ব্যবসার হিসাব নিকাশ। সব শেষ ক'রে যখন অন্দরে যেতেন তখন গিরিবালা গভীর ঘুমে অচেতন।

এতদিন পরে পিনাকীপ্রসাদের মনে পড়ল, গিরিবালার আর দোষ কোথায়! স্বামীর সাহচর্য পাবার সে তো কম চেষ্টা করে নি। সেবাযত্ন, আদর-আপ্যায়নে কাছে টানার চেষ্টা করেছে। ভালবেসেছে তার গ্রাম্য অন্তর দিয়ে, গ্রাম্য প্রথায়। ঐশ্বর্যের মাঝখানে বসেও নিজের জন্য এক মুঠো সম্পদ তোলে নি। আবরণ আভরণের কোন কামনা নয়, কোন-দিন হাত পেতে পিনাকীপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নি। লোলুপ

স্বার্থপর সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পিনাকীপ্রসাদ নতুন চোখে গিরি-বালাকে দেখলেন। বেশ মনে হল, তিনি অবহেলাই করেছিলেন, অনাদর আর উপেক্ষায় এক কোণে গিরিবালাকে সরিয়ে রেখেছিলেন, দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন।

হঠাৎ পিনাকীপ্রসাদের কথাটা মনে পড়ল। গিরিবালার জন্য কিছু একটা করা দরকার। কোন স্কুলে কিছু টাকা দিয়ে কোন প্রাইজের বন্দোবস্ত, কিংবা হাসপাতালে স্থায়ী কোন বেড। কিছু একটা করতে হবে যাতে গিরিবালার নামটা থাকে। চলতে ফিরতে নজরে আসে মানুষের, সময়ে অসময়ে মনে করে।

অফিসে ঢুকতেই সেক্রেটারি টাইপ করা কাগজ সামনে রেখে দিল। বিকেলের দিকে স্যার হোরমসজার সঙ্গে দেখা করার কথা। একটা কাপড়ের মিল শুরু করার তোড়জোড়। স্যার হোরমসজীকে পেলে হু হু ক'রে শেয়ার বিক্রি হয়ে যাবে। বিখ্যাত শিল্পপতি হিসাবে স্যার হোরমসজীর নাম কারো অজানা নয়। কোলিয়ারী, পাটের কল, চামড়ার কারখানা, শেলাক চা বাগান—সবই তাঁর নামের স্পর্শে ধন্যই শুধু নয়, এ সবের তিনি কর্ণধারও। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন শিল্পপ্রচেষ্টা গড়ে তোলা অভাবনীয়। অনেকদিন থেকেই পিনাকীপ্রসাদ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কাজের অজুহাতে স্যার হোরমসজী এড়িয়ে গেছেন। ইদানীং আরো কয়েকজন তাঁর পিছনে লেগেছে এ খবর পিনাকীপ্রসাদের কানে এসেছে, সেজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি আর একবার দেখা করতে চান। তাঁকে চেয়ারম্যান ক'রে পিনাকীপ্রসাদ নতুন এক কাপড়ের মিলের পত্তন করবেন, এই ইচ্ছা। দুপুরের দিকে আরো কয়েকজন আসবেন এ বিষয়ে আলোচনা করতে।

অফিসে কাজ করতে করতে পিনাকীপ্রসাদ বারকয়েক অন্যমনস্ক হ'য়ে

গেলেন। এক চিঠির বদলে স্টেনোকে অন্য চিঠি লেখাতে গিয়েই থেমে গেলেন। নীরস ফাইলগুলোর অন্তরালে সরস এক মুখের ইশারা, টেণ্ডার আর কোটেশনের ফাঁকে ফাঁকে আয়ত দুটি চোখের আভাস, সরে যাওয়া মানুষটার নাতিদীর্ঘ ছায়া পার্টিশনের কাঠের ওপরে।

পিনাকীপ্রসাদ মন একরকম ঠিক ক'রেই ফেললেন। নতুন কাপড়ের মিলটার নাম দেবেন, গিরিবালা কটন মিল। স্কুল আর হাসপাতালের চেয়ে এ অনেক ভাল। ব্যবসায়ীর স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু কল্পনাও করা যায় না। স্যার হোরমসজীকে চেয়ারম্যান ক'রে নতুন প্রচেষ্টা।

বিকেলের দিকে কাজের চাপে আর লোকজনের ভিড়ে পিনাকী-প্রসাদ তলিয়ে গেলেন। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। মাঝে মাঝে টেলিফোনের শব্দ। দূর দূরান্তর থেকে শেয়ারের খোঁজ, উঠতি-পড়তি, তেজীমন্দার খবর। ঠিক পাঁচটা বাজার মুখে সেক্রেটারি মনে করিয়ে দিলেন। স্যার হোরমসজীর সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা হয়েছে। তিনি সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকবেন।

পিনাকীপ্রসাদ উঠে পড়লেন। দেরি করলেই নিরিবিলি পাওয়া মুস্কিল হবে। লোকজনের ঝামেলায় মনের কথা বলবার ফুরসতই পাওয়া যাবে না। স্যার হোরমসজীকে যেমন করেই হোক রাজী করাতেই হবে। উঠতে উঠতেও একটু সময় নিল। কয়েকটা জরুরী চিঠিতে সই করা বাকি, রামপুরের এজেন্সি অফিসে ছোটখাট গোলমাল, কয়েকজনের মাইনে বাড়াবার আবদার। সব শেষ ক'রে পিনাকীপ্রসাদের উঠতে পাঁচটা পনরো। অবশ্য এমন কিছু দূর নয়, মোটরে দশ মিনিটের মামলা।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলেন স্যার হোরমসজী সস্ত্রীক বসে আছেন। বোধ হয় বাইরে বেরোবেন।

পিনাকীপ্রসাদকে দেখে বললেন, আসুন পিনাকীবাবু, কি খবর বলুন। পিনাকীপ্রসাদ খবর বললেন। লোকসংখ্যার তুলনায় কাপড়ের মিলের সংখ্যা যে কত নগণ্য তার একটা হিসাব দিলেন। মোটামুটি কাপড়ের মিল চালাবার একটা খসড়াও রাখলেন টেবিলের ওপর।

কিন্তু স্যার হোরমসজী মাথা নাড়লেন। উঁহু, আর নয়। দশটা জালে জড়িয়ে পড়েছেন। বয়সও হচ্ছে, সব কিছু নিজে দেখাশোনাও করতে পারেন না। বেশি পরিশ্রম করা ডাক্তারেরও নিষেধ। পিনাকী-প্রসাদ ওঁকে রেহাই দিন। লোকের অভাব। নামজাদা সব ব্যবসায়ী রয়েছেন শহরে। হীরামল কোঠারি, মিস্টার অরুণ মিত্তির, রায়বাহাদুর যাদব ঘোষাল। এঁদের কাউকে ধ'রে নামিয়ে দিন। নাম আছে, পয়সা আছে, খাটবার শক্তি আছে। ঠিক চালু হ'য়ে যাবে মিল।

পিনাকীপ্রসাদ দুটো হাত যোড় করলেন। স্যার হোরমসজীর কাছে ওঁরা! চাঁদের কাছে জোনাকি! তাছাড়া ওঁকে কিছু খাটতে হবে না, শুধু নামটা ধার দিতে হবে, ব্যস, বাকি সব কিছু পিনাকীপ্রসাদই করবেন।

হোরমসজী তবুও অরাজী। এর আগেও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার প্রস্তাব নিয়ে মিস্টার লিনটন এসেছিলেন, ওঁকে চান চেয়ারম্যান হিসেবে, হোরমসজী অনুরোধ এড়িয়ে গেছেন।

পিনাকীপ্রসাদ নাছোড়বান্দা। স্যার হোরমসজীকে না পেলে কটন মিল শুরু করার কোন মানেই হয় না। এ বয়সে খাটতে অবশ্য তিনি পারবেন না, কিন্তু খাটার দরকারও নেই। শুধু নামটা থাকলেই হ'ল। কলিতে নামই সার। হঠাৎ পিনাকীপ্রসাদের নজর পড়ল লেডী হোরমসজীর দিকে। যৌবনের অপরাহ্ণ, কিন্তু সারা দেহে অস্তরাগের

ঝিলিক। আইরিশ মহিলা। কি একটা কলকব্জা কিনতে স্যার হোরমসজী বিলাত গিয়েছিলেন, ফিরলেন পামেলাকে সঙ্গে নিয়ে, একেবারে বিয়ে ক'রে। পামেলা শাড়ি পরেন, পারসী মন্দিরেও যান। তাছাড়া সব সময়ে থাকেন স্বামীর পাশে পাশে। স্যার হোরমসজীর সমস্ত প্রচেষ্টায় তাঁর অন্তরের স্পর্শ।

—কিন্তু আমি কটন মিলের স্কিম প্রায় তৈরিই করে ফেলেছি, পিনাকীপ্রসাদ শেষ চেষ্টা করলেন, আপনাকে চেয়ারম্যান করব আর মিলের নাম রাখব পামেলা কটন মিল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে পামেলা চমকে মুখ তুলে চাইলেন। এ বয়সেও দু গালে রক্তের ছোপ, দু চোখে সলাজ ছায়া। ঠোঁট চাপা হাসিতে বঙ্কিম।

স্যার হোরমসজীও হাসলেন। ভ্রূ তুলে বললেন, আপনি যখন এতটা এগিয়েছেন তখন আমার আর বলবার কিছু নেই। যদি মনে করেন আমার নাম থাকলে আপনার সুবিধা হবে, তাহলে আমার আপত্তি নেই। দিন কাগজপত্র কি সই করতে হবে।

পিনাকীপ্রসাদ আর সময় নষ্ট করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে ধরলেন কাগজপত্র। সই শেষ ক'রে স্যার হোরমসজী আর লেডী পামেলা হোরমসজীর সঙ্গে করমর্দন শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর হাসি।

কিন্তু মোটরে উঠে পিনাকীপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করলেন। কোথায় যেন একটা ভুল হ'য়ে গেল। কটন মিলের প্রসপেক্টাসটা বের ক'রে মন দিয়ে পড়লেন, স্যার হোরমসজীর সইগুলোও দেখে নিলেন ভাল করে, সব ঠিক আছে। যন্ত্রপাতিগুলোও অর্ডার দিয়েছেন বিখ্যাত বিলাতী ফার্ম সিমসন অ্যাণ্ড কোম্পানিতে। কোথাও তো ভুল হয় নি,

কিন্তু মনের অতলে ফুটে থাকা একটা কাঁটা খচ খচ ক'রে উঠল। ভুল একটা হয়েছে, তাঁর নবতম প্রচেষ্টায় কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে গিয়েছে—কিংবা ফাঁকি। অনেক ভেবেও পিনাকীপ্রসাদ কিছু ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না।

মথুরাকাঠির মাস্‌টার

এক পাশে মথুরাকাঠি, অন্যদিকে বাঁজা সুদূরপ্রসারিত মাঠ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হরিতকীর কারখানা। স্তূপীকৃত রেল লাইনের ভগ্নাংশ। অব্যবহার্য লোহার টুকরো। অ্যাসফাল্টাম মোড়া বিসর্পিল পথ, দুপাশে বালুর পাড়। চলতে চলতে ক্লান্তি আসে। কড়া রোদে চোখের দৃষ্টি স্তিমিত হয়। কোথাও ছায়ার দাক্ষিণ্য নেই, চোখের ওপরে হাত আড়াল দিয়ে চলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে হয়, কোঁচার খুঁট খুলে বাতাস করতে হয় নিজেকে। নিজেরই অজ্ঞাতে মুখ থেকে ক্লান্তিসূচক অব্যয় নিঃসারিত হয়।

খুব সামান্য শব্দ, আপনার নিজের কানেও পৌঁছোয় কিনা সন্দেহ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন মথুরাকাঠির প্রাইমারী স্কুলের দাওয়া থেকে এক ভদ্রলোক উঠে এসে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছেন। নাতিদীর্ঘ মানুষ, কাঁধে পাটকরা চাদর, মুখ দেখে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। বলিরেখাঙ্কিত ললাট, দু'গালে হিজিবিজি নকশা, কোটরগত চোখ দীপ্তিহীন। সংগ্রাম-ক্লান্ত দরিদ্র-জর্জর কাঠামো।

এই রোদে কোথায় চলেছেন? কথায় পূর্ববঙ্গের টান। ঠিক কোথায় চলেছেন আপনার পক্ষে বলা দুষ্কর। চাকরির ক্ষীণ আশা, খুব ক্ষীণ, কিন্তু আপনার বর্তমান অবস্থায় তার ওপর নির্ভর করেই এগোতে হচ্ছে। কণ্ট্রাক্টর যোগেন্দ্র সিং। পঞ্চনদীর কূল থেকে

ভাগীরথীর কূলে ডেরা বেঁধেছেন। আড়াইশো লোক খাটছে তাঁর তাঁবে। একটা মানুষকে চাকরি দেওয়া শুধু তাঁর স্মিতহাস্যের অপেক্ষা। অবশ্য দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে সে হাসি দেখার সৌভাগ্য বিশেষ কারো হয় না। আপনার হয়েছিল, কারণ আপনার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় যোগেন্দ্র সিংয়ের বাড়ির ডাক্তার। যোগেন্দ্র সিংয়ের স্টিল ফ্রেম, রোগ-বালাইয়ের সেখানে প্রবেশ অধিকার নেই, কিন্তু তাঁর জেনানা আজন্ম-রুগ্ন। খাওয়া-দাওয়ার এত তরিবৎ, জলহাওয়া বদলানোর চেষ্টা, কিছুতেই কিছু নয়। যোগেন্দ্র সিংয়ের দেহে বছরের পর বছর যে অনুপাতে রক্ত জমে ওঠে, তার জেনানার দেহও ঠিক সেই পরিমাণে রক্তশূন্য হয়। সেই আত্মীয় ডাক্তারটির পরিচয়পত্র নিয়ে আপনি একবার যোগেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করেছিলেন। ওঁর ক্যানিং স্ট্রীটের অফিসে।

পরিচয়পত্রটা সব যোগেন্দ্র সিং পড়েন নি, দুর্জনে বলে ইংরেজি ভাষার ওপর দখল খুব জোরালো নয়, কিন্তু ডাক্তারের নাম দেখেই স্মিতহাস্য করেছিলেন। বলেছিলেন, ঠিক আছে বাবু, মাস দুয়েক পরে আপনি খড়গপুরে একবার দেখা করবেন আমার সঙ্গে। ইয়াদ করিয়ে দেবেন একটু। কাজের জন্য বছরখানেক ওইখানেই থাকব।

শুধু তাই নয়। কাগজে নকশা এঁকে ওঁর ঘাটিটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অরোরা সিনেমার পাশ দিয়ে বম্বে রোড ধ'রে সোজা চলে যেতে হবে। মথুরাকাঠি বাঁ দিকে রেখে, নিমপুরা ছাড়িয়ে আরো সামনে।

এ ছ মাস আপনার কেটেছে উমার তপস্যার মত। ওই নকশাটি বুকে চেপে বিনিদ্র রজনীযাপন। সপ্তাহান্তে একবার কালিঘাটে মাথা ঠুকে এসেছেন, মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরেও। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে

ধারধোর করে খড়গপুরে এসে নেমেছেন। কিছু যে একটা হ'য়ে যাবে তেমন একটা বিশ্বাস প্রায় মাদুলি ক'রে গলায় পরেছেন। আপনার সেই আত্মীয়-ডাক্তারটি কার্যব্যপদেশে আসামে, নয় তো আসার সময়ে তাঁর কাছ থেকে আর একটা পরিচয়পত্র যোগাড় করতেন।

কিন্তু এত সব কথা সামনে দাঁড়ান ভদ্রলোকটিকে বলা চলে না, তাই আপনি ঘাড় নেড়ে শুধু বললেন, একটু কাজে বেরিয়েছি।

ভদ্রলোক আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুললেন, এই রোদে? আপনি পাগল নাকি? শেষকালে সর্দিগর্মি হ'য়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়বেন, সেটা ভাল হবে?

আপনার সাত বছরের বেকার জীবনে এমন সহানুভূতিমাখানো কথা শোনবার অবকাশ হয় নি, এমন দরদীকণ্ঠ! বেশির ভাগ আত্মীয়স্বজন আপনাকে এড়িয়ে গেছেন, কিছু পরিমাণ বন্ধুবান্ধবও। বলা যায় না, কথার ফাঁকে ধার চেয়ে বসাও আশ্চর্য নয় কিংবা চাকরির উমেদারিপত্র।

আপনি কোঁচার খুঁট ঠিক করতে করতে বললেন, এ আর এমন কি রোদ! এর চেয়েও কড়া রোদে চলাফেরা করেছি।

ভদ্রলোক উত্তরে হাসলেন। অপরিষ্কার দাঁতের সার। পানের ছোপলাগা। গলা একটু চড়িয়ে বললেন, ওরকম বড়াই করবেন না মশাই। ওয়ার্কশপের তেলেগু ফিটার বাজনু, দশাসই চেহারা, হ্যা বুকের ছাতি, মাইনে নিয়ে এই পথ দিয়ে ফিরছিল, কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন, বললেন, আসুন মশাই, স্কুলের দাওয়ায় একটু বসে যাবেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা হয় না।

আপনি একটু ইতস্তত করলেন, কিছুটা বিব্রত বোধ। অবশ্য অসুবিধা এমন কিছু নেই। এখনও অঢেল সময়। প্রায় সমস্ত দিনটা হাতে রয়েছে আপনার। স্টেশন থেকে কোথাও আশ্রয় নেবার সুবিধা

নেই বলেই এই দুপুর রোদে আপনাকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে। আপনি আর দ্বিরুক্তি না করে ভদ্রলোকের পিছন পিছন উঠে পড়লেন।

দাওয়ার ওপর গোটা দশেক ছাত্রের জটলা। পড়ায় বিশেষ মনোযোগী এমন মনে হ'ল না। দু-একজন দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমোবারও চেষ্টা করছে।

কিছু একটা বলতে হবে এই ভেবে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা বুঝি আপনার ছাত্র?

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলেন। লাল চোখ, ফেনা জমে উঠল ঠোঁটের দুপাশে।

—ছাত্র? শত্রু, শত্রু, সব কটা শত্রু আমার। তেতাল্লিশ টাকা বারো আনা মাইনে দিয়ে কিনে রেখেছে আমায়। পাশ করলে মাইনে বাড়াবার চেষ্টা নেই, ফেল করলে গার্জেনদের চোখ রাঙানি। বলেন কেন?

দাওয়ায় উঠে ভদ্রলোক একটা কাপড়ের আসন টেনে দিলেন সামনে, বললেন, নিন বসুন।

আপনি উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে বললেন, এদের পড়ার অসুবিধা হবে না তো?

—এদের অসুবিধা আর আপনি কতটুকু করবেন, ভগবানই সবটুকু ক'রে রেখেছেন। না পায় ভাল খেতে, না পায় ভাল পরতে। আর থাকে যেখানে তা শূয়োরের খোঁয়াড়েরও অধম।

কথার শেষ দিকটায় ভদ্রলোকের দুটো চোখ ছলছলিয়ে এল। আপনি বিস্মিত হবেন। তাপদগ্ধ মরুর মাঝখানে ওয়েসিসের টুকরো। দারিদ্র্য-জার্ণ মানুষটার অন্তস্তলে ফল্গুর প্রবাহ।

আপনি আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে শুরু করেন, এতে আর ক্ষোভের কি

আছে মাস্টারমশাই, আমাদের দেশে যাঁরা বড় হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাইয়েরই তো জন্ম গরীবের ঘরে।

মাস্টার হেসে উঠলেন। বিবর্ণ দাঁতের সার। গালের রেখা আরো কুঞ্চিত, আরো গভীর। হাসি থামিয়ে বললেন, সে সবও আমি এদের বুঝিয়েছি স্যর। উদাহরণও দিয়েছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলের কথা বলেছি; কিন্তু এরা মুচকি মুচকি হাসে। বিশ্বাসই করতে চায় না। একজন তো স্পষ্টই বললে একদিন, ওঁদের কথা বাদ দিন মাস্টারমশাই, ওঁদের বাপেদের একশ টাকায় দশজনকে খাওয়াতে হয় নি। আলো-বাতাসের সম্পর্কহীন খুপরিতে থেকে পাঁজরায় মারাত্মক বীজাণু বাসা বাঁধে নি। দিনের পর দিন কচুর শাক দিয়ে গলা-ভাত গিলতে হয় নি।

মাস্টারমশাইয়ের দিক থেকে আপনি ছাত্রদের দিকে চোখ ফেরালেন, জোনাকির মতন জ্বলছে একরাশ চোখের সার। দৃষ্টি নয় দাহ। গালের চোয়াল প্রকট, পঞ্জরসার দেহ।

মাস্টারমশাই আপনার হাঁটুতে হাত রাখলেন, দধীচির হাড়ে বজ্র হয়েছিল বৃত্রাসুর নিধনের জন্য, আমাদের হাড়ে অজ্ঞানাসুর বধ হবে এমন একটা আশা অনেকেই হয়তো করেন, কিন্তু ঘুণধরা হাড়ে বাঁশি ছাড়া আর কিছু হবে না।

আপনি একটু মুশকিলে পড়ে যান। পথ থেকে ডেকে এনে এসব কথা শোনাবার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া মুশকিল-আসান করার মালিক যখন আপনি নন।

আপনার চোখের দৃষ্টিতে হয়তো অসহায়ভাবটা ফুটে ওঠে, মাস্টার-মশাই নিজেকে সামলে নেন। গলার স্বর পালটে বলেন, দেখুন দেখি পথ থেকে টেনে এনে আপনাকে নিজের দুঃখের পাঁচালি শোনাচ্ছি।

আমাদের দুঃখ তো রয়েইছে, চিরকালই থাকবে। আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন ?

আপনি ঘাড় নাড়েন। এর পরের প্রশ্ন কি হবে কতকটা আন্দাজও করতে পারেন। কিন্তু মাস্টারমশাই সেদিক দিয়ে যান না। ছাত্রদের দিকে চেঁচিয়ে বলেন, এই সব হাঁ করে চেয়ে আছিস যে ? মনে মনে পড়তে আরম্ভ কর। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর-গুঞ্জন।

—এখানে উঠেছেন কোথায় ? মাস্টারমশাই আপনার দিকে মুখ ফেরালেন।

—কোথায় আর উঠব। এখানে চেনাশোনা কেউ নেই। আপনি আমতা আমতা করলেন।

—আরে খড়্গপুরে ওঠার ভাবনা ! জানাশোনার দরকার নেই, সোজা গিয়ে রেলওয়ে কলোনীতে ম্যাসিমার খোঁজ করবেন। কত উটকো লোক এসে ওঠে ঠিক-ঠিকানা নেই। উড়িয়া-গির্জার সামনাসামনি লাল রংয়ের বাংলো।

—আপনার মাসিমা। আপনি একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

—শুধু আমার কেন, আপনার আমার সকলেরই। আপন পর নেই, জাত বিচার নেই—গিয়ে উঠলেই হল ! যত্ন-আত্তির পরিসীমা থাকে না। যেমনি ম্যাসিমা, তেমনি ম্যাসোমশাই।

আপনি আবার হোঁচট খান। বিকৃত উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই নয়, মেদুর কণ্ঠস্বরে। বলেন, ম্যাসোমশাই।

—হ্যাঁ, শতদলবাবু শিবতুল্য লোক। তাঁর আশ্রয়েই তো আমি আছি। একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে। ছোট মেয়ে কাজলকে পড়াই, তার বদলে থাকা। উনি না থাকলে এতদিন রেলের চাকার তলায় মাথা দিতে হ'ত। নোয়াখালি ছাড়ার পর পাগলের মতন দেশে

বিদেশে ঘুরেছি। একমুঠো ভাতের জন্য, মাথার ওপর একটা আচ্ছাদনের জন্য লোকের দোরে দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কথা শেষ করে মাস্টারমশাই নিশ্বাস ফেললেন। পাঁজর কাঁপিয়ে। এই অবসরে আপনি আপনার আবেদনটা জানালেন। কথাটা অনেক আগেই বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ফুরসত পাচ্ছিলেন না।

—একটু জল খাওয়াতে পারেন? এদিক ওদিক চেয়ে আপনি বলেই ফেললেন কথাটা।

—বিলক্ষণ, মাস্টারমশাই চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন, তারপর ছাত্রদের দিকে চেয়ে বললেন, শম্ভু, তোর বাড়ি সবচেয়ে কাছে। এক গ্লাস জল নিয়ে আয় দিকিনি।

কথা শেষ হবার আগেই শম্ভু তীরবেগে ছুটল কোণাকুণি মাঠ বরাবর। মাস্টারমশাই ঝাঁকিয়ে বসলেন।

—তেতাল্লিশ টাকা বারো আনা মাইনে, তার মধ্যে থেকে বুড়ী মাকে কুড়ি টাকা পাঠাতে হয়। তাঁকে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাসায় রেখে এসেছি। আত্মীয় মানে গ্রাম সুবাদে দূর সম্পর্কের। থাকা-খাওয়ার বদলে মাকে খাটতে হচ্ছে গতরে। এক কথায় ঝি-গিরিই ধরুন না। বাকি টাকায় আমার দু বেলা খাওয়া, জামা কাপড় সব। দু বেলার চা-টা অবশ্য ম্যাসিমার ওখানেই পাই। বলুন, এভাবে চালান কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

আপনি উত্তরে আর একবার মাস্টারমশাইয়ের আপাদমস্তক দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এবার মনে হ'ল মাস্টারমশাইয়ের বয়স হয়তো বেশি নয়। পঁচিশের ওদিকে তো নয়ই, কিন্তু উত্তর-যৌবনের নখরচিহ্ন দেহের সর্বত্র। বুভুক্ষার স্বাক্ষর প্রতিটি অঙ্গে।

আপনি বেকার। তবু আপনার অবস্থা এতটা মারাত্মক নয়। আপনার সমস্যা শুধু নিজেকে ঘিরে। বাড়তি কোন মুখের গ্রাসের চিন্তা আপনার নেই। আপনি বেশ একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন এবার। বন্ধু মহলের কথা শুনে শুনে আপনার ধারণাই হয়েছিল, আপনি চরম অভাগা। কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারলেন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকটির অবস্থা আপনার চেয়েও দীন।

—বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, মাস্টারমশাই ফিসফিস করে বলতে শুরু করলেন, দেশে আমাদের অবস্থা ভালই ছিল। বাবা উকিল ছিলেন, রোজগার মন্দ ছিল না। তার ওপর সুপারি, নারকোল, অভাব কিছুই ছিল না। আপনারা কাগজে দেখলেন কলমের আঁচড়ে দেশ দু-ভাগ হ'য়ে গেল, কিন্তু সেটা কলমের আঁচড় নয়, ছুরির ফলা। সরাসরি আমাদের বুকে বিঁধল। এত বছর হ'য়ে গেল, অথচ রক্তক্ষরণ এখনও বন্ধ হয় নি। বাবা এদেশে আসার আগেই হার্টফেল করলেন।

মাস্টারমশাইকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা অবশ্য আপনার জানা ছিল। খবরের কাগজে নেতাদের উদ্বাস্তু-ভোলানো বক্তৃতা আপনি অনেক পড়েছেন। কিন্তু খড়গপুরের এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে, প্রাইমারী স্কুলের দাওয়ায় মাস্টারমশাইয়ের মুখোমুখি বসে সে সব কথা উচ্চারণ করতে আপনার ইচ্ছা হ'ল না। শুধু মাস্টারমশাই নয়, তাঁর ছাত্ররাও রয়েছে। অর্ধাশনের সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড়, স্তোকবাক্যে হয়তো আস্থাও কম।

ইতিমধ্যে শম্ভু এসে পড়ল। একহাতে জলের গ্লাস, অন্য হাতে রেকাবিতে দুটো কলা, একটা পেঁপের ফালি।

আপনি আপত্তি জানালেন, না না, এসব আবার কেন ?

মাস্টারমশাই হাসলেন, ওই তো দোষ! নিজেরা মরতে বসেছিস অথচ চক্ষুলজ্জাটুকু গেল না। গত বছরে জানলেন স্যর, মাস্টারমশাই আপনার দিকে ঘুরে বসলেন, ওয়ার্কশপের এক হোমরাচোমরা অফিসরের মেয়ের বিয়ে। ম্যাসোমশাইয়ের সঙ্গে থাকি ব'লে আমারও নেমন্তন্ন জুটে গেল। ভাবলাম ভালই হ'ল একবেলার খাওয়ার খরচটা বেঁচে গেল। হায়রে বরাত! বড়লোকেব বড় কাণ্ড। স্রেফ এক গ্লাস শরবত আর একটি ক'রে লাল গোলাপ ফুল। এর চেয়ে স্যর দু'গালে দুটো চড় যদি মারত, তাও ভাল ছিল। বিয়ের ব্যাপার চুকতে বাত হ'যে গেল। হোটেল বন্ধ। বুঝুন অবস্থাটা।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আপনাব দিকে নজর পড়তেই মাস্টারমশাই চেঁচিযে উঠলেন, একি ব'সে আছেন হাত গুটিযে! নিন, নিন, খেযে নিন ও ক'টা।

অগত্যা আপনি খেতে শুরু কবেন। এত কথা না বললেও আপনি ফেলে কিছুই রাখতেন না। ট্রেনে ওঠার পর থেকে আপনাবও কিছু জোটে নি। আপনার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত মাস্টারমশাই অপেক্ষা কবেন। ওবই ফাঁকে দু একটি ছাত্রকে পড়াও জিজ্ঞাসা করলেন। ধমকানিও দিলেন দু একজনকে। তাবপর আপনাব দিকে চেযে বললেন, এখানে থাকবেন তো দিনকযেক? থেকে যান, হিজলী দেখে যান, কাঁসাই নদীর ব্রিজ। আমি সঙ্গে করে সব দেখাব। খড়গপুবে ছবছরের ওপর রযেছি। এখানকার সব কিছু আমার নখদর্পণে।

আপনি উত্তরে জানালেন, থাকা সম্ভব নয। পবের দিন বিকেলেই কলকাতা রওনা হ'তে হবে।

তারপর কিছুক্ষণ কোন কথা হ'ল না। আপনারা দু'জনেই বাইরে চোখ ফেরালেন। ধুলোর ঘুর্ণি। অনেকদূবে গাছের ফাঁক থেকে চিলেব

একটানা চিৎকার। আকাশ থেকে তরল আগুন ঝরছে পৃথিবীর ওপর। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। চোখ জ্বালা করে ওঠে। ঝিমঝিম করে কপালের ছুটো পাশ।

—জানেন, মাস্টারমশাই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, আই-এ পাশ করেছি এখানে এসে। ছেলে ঠেঙানোর পরে রাত্রে ক্লাস করেছি। ব্যাকবণতীর্থ উপাধিও আছে, কিন্তু বরাতে ভাল স্কুলে আর কিছু জুটল না।

—চেষ্টা করেছিলেন অন্য কোথাও? আপনি প্রশ্ন করলেন। একহাতে গ্লাস আর রেকাবিটা সরিয়ে রেখে।

—করিনি, মাস্টারমশাই ঠোঁটে হাসির ছিটে ফোটালেন, খড়গপুরের আশে-পাশে যত স্কুল ছিল জানাশোনা, সব জায়গায় কপাল ঠকেছি। খুঁটির জোর না থাকলে কিছু হবার নয়। লোকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে, বাড়ির বাড়তি কাজ করিয়ে নিয়েছে নানা ছুতোয়, কিন্তু মাস্টারির সুবিধে হয় নি। অথচ ম্যাট্রিক পাশ লোকেরাও ঢুকে পড়েছে ছু একটা প্রাইমারী স্কুলে। দিব্যি মাস্টারি করছে। মোটামুটি ভাল মাইনে।

এবারেও মাস্টারমশাই নিশ্বাস ফেললেন। নিশ্বাসে আপসোসের নিশেল।

এই স্কুলটা এখানকার উদ্বাস্তুরাই গড়ে তুলেছে, মাস্টারমশাই স্কুল-বাড়ির দিকে আঙুল দেখালেন, নিজেরাই ভাল করে খেঁতে পায় না, কোথায় বা পাবে বাড়তি পয়সা। নিজেদের মধ্যে চাদা তুলে আরম্ভ করে বছর চারেক আগে। আমি আছি আর একজন ছিলেন উঁচু ক্লাসে। এই ছুজন মাস্টার।

—ছিলেন? আপনি বিস্ময় প্রকাশের চেষ্টা করলেন।

—তা ছাড়া আর কি! তিনদিন হ'ল ভদ্রলোক ওয়ার্কশপে ঢুকে

পড়েছেন। বেঁচে গেছেন, উদ্ধার হ'য়ে গেছেন এ নরক থেকে। তাঁর জায়গায় আর একজনকে নেওয়া হবে। উঁচু ক্লাসে আমি পড়াতে পারি এটা কেউ মানতে রাজী নন। অবশ্য তফাতটা আর কি! তেতাল্লিশ টাকা বার আনা আর বাহান্ন টাকা দু আনা।

—ওয়ার্কশপে আপনিও তো চেষ্টা-চরিত্র করতে পারেন। আপনি একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন। ওঠার মুখে দু একটা সদুপদেশ।

—ওয়ার্কশপে? মাস্টারমশাই কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে রইলেন। ভ্রূ দুটো কপালের কাছ বরাবর। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বললেন, ব্যাকরণতীর্থ পাস করে কারখানায় হাতুড়ি পেটাব? মিস্ত্রীগিরি করব এত লেখাপড়া শিখে? অবশ্য বলতে পারেন, রিফিউজীর আবার দেমাক। ভিক্ষের চাল কাঁড়া না আকাঁড়া! ঘোরাঘুরি করলে হয়তো ছোটখাটো একটা কাজ জুটেও যেতে পারে, কিন্তু এদের কথা ভেবে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। তেতাল্লিশ টাকা বার আনায় লোক পাওয়াই মুশকিল, অন্তত আই-এ ব্যাকরণতীর্থ পাশ।

মাস্টারমশাইয়ের শেষদিকের কথাগুলো ভেজা ভেজা। মনে হ'ল কষ্টে আবেগ দমন করছেন।

অন্য সময়ে, অন্য কোথাও এ ধরনের কথা শুনলে আপনার মনে হ'ত অহঙ্কারের ছিটে রয়েছে ভাষায়। নিজের কৃতিত্বের বড়াই। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মুখচোখের চেহারা, বলার ভঙ্গি দেখে এ ধরনের কিছু আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। মনে হবে, সামনে বসা ছাত্রের দল বাইরের কেউ নয়, ওঁরই পাঁজরের অংশ।

এবার আপনি উঠে পড়ার চেষ্টা করলেন। খুলে রাখা ক্যামবিসের জুতো জোড়া পায়ে গলাতে গলাতে বললেন, এবার উঠি। অনেকটা যেতে হবে। রোদের তাপ যে বিশেষ কমেছে এমন নয়, ঝাঁজ একটু

হয়ত অল্প। কতটা পথ আপনাকে হাঁটতে হবে আপনার জানা নেই, কাজেই একটু আগে উঠে পড়াই ভাল।

মাস্টারমশাই বাধা দিলেন না। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

—কিন্তু আমি বোধ হয় আর পারব না।

—কি পারবেন না? আপনি চলতে চলতে থেমে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—এই এভাবে চালাতে। ভেবেছিলাম নিজের যত কষ্টই হোক, সারা জীবন এদের পড়িয়ে যাব। এরা যদি মানুষ হয়, একজনও দাঁড়াতে পারে মাথা উঁচু ক'রে। দারিদ্র্য, নীচতা, হিংসা সব ছাড়িয়েও পৃথিবীতে নিজেদের পরিচয় রেখে যেতে পারে। কিন্তু তা আর হবার নয়। দারিদ্র্যের কাছে আমাকে মাথা নোয়াতে হবেই। ছাত্রদের সামনে কথাটা আর বলতে চাই নি।

তারপরের ব্যাপারে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। মাস্টারমশাই নিচু হ'য়ে কোঁচার খুঁটে নিজের দুটো চোখ মোছার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তার আগেই বড় বড় জলের ফোঁটা বালির ওপর ঝরে পড়ল। আপনি ভালো ক'রে চেয়ে দেখবার আগেই বুভুক্ষু বালি আর এক বুভুক্ষুর চোখের জল নিঃশেষে শুষে নিল।

মাস্টারমশাই সোজা হয়ে পকেট থেকে দোমড়ান একটা পোস্টকার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন আপনার দিকে।

—এই নিন পড়ে দেখুন, এরপর নিজের বত আঁকড়ে থাকার জোর থাকে মানুষের?

হঠাৎ পরের একটা চিঠি হাত বাড়িয়ে নিতে আপনি কিন্তু বোধ করেন। অবশ্য চিঠিটা না নিয়ে আপনি ভালই করেছেন, নিলেই যে সবটা পড়তে পারতেন এমন ভরসা কম। আঁকাবাঁকা জড়ান হাতের

লেখা, মাঝে মাঝে জলে অস্পষ্ট। পোস্টকার্ডটি মাস্টারমশাইয়ের মা লিখেছেন অন্য কারুকে দিয়ে। জলটা সম্ভবত চোখের, কিন্তু তা মায়ের না ছেলের সেটা বোঝা আপনার পক্ষে খুবই কঠিন হ'ত।

আপনার ইতস্তত ভাব দেখে মাস্টারমশাই পোস্টকার্ডটা পড়তে আরম্ভ করলেন। ধরাগলায়। ভূমিকা হিসাবে বললেন, কলকাতা থেকে মা লিখেছেন।

কয়েক লাইনের চিঠি। দু মুঠো ভাত আর আস্তানার বদলে কি নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে তারই বিবরণ। ছেলে উদ্বিগ্ন হবে বলে এসব কথা এতদিন তিনি লেখেন নি। ছেলেকে জানাতে চান নি ঘুণাক্ষরে। কিন্তু ইদানীং সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছে। এতদিন ভাঁড়ার থেকে জিনিস চুরির অপবাদ তো ছিলই, এবার ভাগ্যে জুটেছে সোনাচুরির অপবাধ। গিন্নীর মেয়ে এসেছে ভাগলপুর থেকে। ডাক্তারের স্ত্রী। হাতে যেমন আড়াই প্যাঁচের অনন্ত, গলায় তেমনি পাঁচ ভরির পাটিহার। সেই হার বাথরুম থেকে উধাও। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু হ'ল। মানুষদের ধরে ধরে জেরা আর জবানবন্দী। প্রমাণ হ'ল কাপড়-চোপড় কাচতে তারপরেই বাথরুমে ঢুকেছিলেন মাস্টারমশাইয়ের মা। আত্মরক্ষার কোন কৈফিয়তই টিকল না। দোষ স্খালনের সমস্ত চেষ্টা নাকচ। তারপর একটানা অকথ্য অত্যাচার। একেবারে শেষদিকে মাস্টারমশাইয়ের মা লিখেছেন, সাতদিনের মধ্যে ছেলে যদি ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যায়, তাহলে নিজের ব্যবস্থা নিজে করা ছাড়া তাঁর আর উপায় থাকবে না। গঙ্গায় জলের অভাব নেই, একটা পাঁচ ফুট মানুষকে তলিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে স্রোতেরও কমতি নেই।

অবশ্য এত সহজে মাস্টারমশাই চিঠিটা পড়তে পারলেন না।

মাঝখানে অনেকবার গলা রুদ্ধ হয়ে এল। নিচু হয়ে অনেকবার কোচার খুঁটে চোখের জল মুছলেন। তারপর আপনার দিকে চেয়ে বললেন, বলুন স্যর, মার এই ঝি-গিরি ঘোচাতে যদি আমাকে মিস্ত্রীগিরিও করতে হয়, তা কি অসম্মানের হবে?

আপনি কোন উত্তর দিলেন না। সব প্রশ্নের সব সময় দেবার মত উত্তর থাকে না।

—ওয়ার্কশপে আমার জানাশোনা কেউ নেই। সেখানে সুবিধা হবে না, তবে আর এক জায়গায় হবার আশা আছে।

—তাই নাকি! আপনি ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। বর্তমান অবস্থায় যে কোন এক জায়গায় চাকরি হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—একটা সুযোগও জুটে গেছে স্যর। যোগেন্দ্র সিং কথা দিয়েছেন।

আপনি এগোবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন, যোগেন্দ্র সিংয়ের নাম শুনে থমকে দাঁড়ালেন। চোখ কুঁচকে মাস্টারমশাইয়ের আপাদমস্তক দেখলেন, তারপর অজ্ঞতার ভান করে বললেন, যোগেন্দ্র সিং?

—হ্যা, নাম শোনেন নি? মস্ত বড় কণ্ট্রাক্টর। কংসবতীর ব্রিজ তৈরি করেছেন, হিজলী কলেজের কিছুটা, এবার রাস্তা তৈরির কাজ আরম্ভ করেছেন।

—আলাপ আছে আপনার সঙ্গে? এবার আপনি বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। দুঃস্থ স্কুলমাস্টার কোন এক ফাঁকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন আবেদনপত্র নিয়ে।

—আলাপ, মাস্টারমশাই মাথায় হাত বোলালেন, আমাদের মতন লোকের সঙ্গে আলাপ আর কিসের! তবে একদিন পরিচয় হয়েছিল। হঠাৎ এই রাস্তায় একদিন যোগেন্দ্র সিংয়ের গাড়ি বিগড়ে অচল। সেদিনও এমনি রোদের তাপ। আমি যোগেন্দ্র সিংকে নামিয়ে স্কুলের

দাওয়ায় বসিয়েছিলাম। ডাবের জল দিয়েছিলাম। তিনি তুষ্ট হয়ে বললেন, বর প্রার্থনা কর্। একটা চাকরি চেয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, মাস চারেক পরে দেখা ক'র আমার সঙ্গে। মনে ভেবেছিলাম, দেখা করার প্রযোজন হবে না। ছাত্রদের নিযেই এ জীবনটা কাটিযে দেব, কিন্তু বিধি বাম। মায়ের এ অপমান যে ঘোচাবার চেষ্টা না করে, সে ছেলে হবার অযোগ্য। বলুন স্তব? তাই ভাবছি, আজ বিকেলেই একবাব দেখা করব যোগেন্দ্র সিংয়েব সঙ্গে। দরকার হয় তো এই পোস্টকার্ডটাই ফেলে দেব তাঁর সামনে। ঠিক দয়া হবে, কি বলুন?

যোগেন্দ্র সিংযের সঙ্গে আপনার পরিচয় খুবই স্বল্প। কিসে কখন তাঁর মন গলে তা আপনার জানা নেই। তবে এইটুকু আপনি বেশ বুঝতে পারেন, মাস্টারমশাইযেব চাকবিব প্রযোজন আপনার চেযে অনেক বেশি। আপনি চাকবি না পেলে, বড জোব আবো কযেকটা দিন অর্ধাহারে চলবে, কিন্তু মাস্টারমশাইযেব চাকবি পাওযাব ওপব ছুটো মানুযেব প্রাণই শুধু নয়, মানও নির্ভব করছে।

ছু এক সেকেণ্ড, তার বেশি ভাববাব সমযও আপনি পান না। ছুটো হাত তুলে মাস্টাবমশাইকে নমস্কার জানালেন। একটু এগিয়ে আলতো হেসে একটা হাত রাখলেন তাঁব কাঁধের ওপব। বললেন, আমাব মনে হয ঠিক আপনাব কিছু একটা হযে যাবে। আপনাব মাকে আপনি খড়গপুরে নিয়ে আসতে পাববেন।

মাস্টারমশাই ছু হাতে আপনাব একটা হাত জড়িযে ধবলেন। অশ্রু ছলছল ছুটো চোখ। কি বুঝি বলতে চাইলেন বিড়বিড় কবে। কিন্তু আপনার সময় নেই। এই মুহূর্তে চলতে না আরম্ভ কবলে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার গাড়ি পাবার আশা কম। অনেকটা পথ। জোরপায়ে

আপনি স্টেশনের পথ ধরলেন। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারের দিকে চাইতে গেলেই দেরি হয়ে যাবে।

তা ছাড়া বলা যায় না, মাস্টারমশাইয়ের দিকে চোখ ফেরালে যদি তাঁর পাশাপাশি পা ফেলে ফেলে যোগেন্দ্র সিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাধ হয়! নিজের প্রাণ বাঁচাবার জোর তাগিদে তলিয়ে যায় ছোট্ট একটা পোস্টকার্ডের কাহিনী!

হাড়-জিরজির চেহারা। পাঁজরা সম্বল। মাংসের বালাই নেই। কাঁচা-পাকা গোঁফের বাহার। কোটরগত চোখ, কিন্তু দৃষ্টি ধারালো। অবশ্য এসব ব্যাপারে দৃষ্টিই তো সব। ভাগাড়ে গরুর দেহ ঠিক নজরে পড়ে শকুনের। পাক খেয়ে খেয়ে বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসে। সে রকম কিছুর সন্ধান পেয়েই বুঝি এখানে এসে জুটেছে।

দাদার ডাকে সুরমা এগিয়ে এসেছিল, এমন একটা চেহারা চোখে পড়তে চৌকাঠ-বরাবর দাঁড়িয়ে পড়লো।

সুকান্ত চোখ তুলে বোনকে দেখল, তারপর অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, কই রে আয়! এঁকে আবার লজ্জা কি?

লজ্জা নয় ভয়। কিছুটা বুঝি ঘৃণারও মিশেল। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে লোকটা নিষ্পলক।

সুরমা গায়ের কাপড় ভালো করে টেনে-টুনে দিয়ে দাদার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

—ইনিই চণ্ডীবাবু। সুকান্ত সামনের ভদ্রলোকের দিকে আঙুল দেখাল, একটু হেসে বলল, পরাগ পিকচার্সের।

ব্যস, এবার বেশ বোঝা গেল লোকটিকে। এতক্ষণ রূপই দেখছিল সুরমা, এবার স্বরূপ। কদিন ধরেই ভদ্রলোকের আসবার কথা। সুকান্ত রোজই অফিস ফেরত অপেক্ষা করে।

সুরমা হাত তুলে নমস্কার করল।

উত্তরে চণ্ডীবাবুও হাত তুলল। দু হাতেই মাদুলির গোছা, তাবিজের বাহার।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো, বসো।

চণ্ডীবাবু কোণের দিকে রাখা খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। বসতে বসতেই সুরমা শুনতে পেলো, দাদা ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে। আট বছর বয়সে ধ্রুব, তারপর একটু বড় হতে বিসর্জনে অপর্ণা, তারপর একটানা নাম। সবই যে ঠিক তা নয়, তবে জিনিস বিক্রির সময়ে অতিরঞ্জন দোষের নয়।

—একটা ফটো যে দরকার। চণ্ডীবাবু গলার আওয়াজ মোলায়েম করল।

—ফটো, হ্যা, অনেক আছে, কখানা চাই?

আশ্চর্য লোক, বোনকে অচেনা লোকের সামনে বসিয়ে সুকান্ত ছবির খোঁজে অন্দরে ঢুকল।

এই ধরনের অবস্থা সুরমার আগেও হয়েছে, তবে এতটা মারাত্মক নয়।

কিছুদিন আগেও প্রতি শনি আর রবিবার এক ব্যাপার। সেজেগুজে ঘাম-জবজব অবস্থায় মাথা নিচু করে লজ্জার ভান করা। মাঝে মাঝে নতুন পাকপ্রণালী থেকে শুরু করে অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালীর প্রশ্নের খোঁচা।

দু একজন মেয়েকে দেখেই চিনতে পেরেছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে। "মেঘসঞ্চার" নাটকে নায়িকা। নিউ এম্পায়ারে একটানা সাত দিন অভিনয় চলেছিল।

সামনের সারিতে বসে এমন মেয়ের অভিনয়ের ছলাকলা উপভোগ করা যায়, কিন্তু বিয়ে করে পাশে বসানো যায় না।

আজ অবশ্য ব্যাপার অন্য। সুরমা যে পেশাদারী দলের সঙ্গে অভিনয় করে, সে কথা ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে, এতদিন সে চেষ্টাই করা হতো। ঘুরিযে ফিরিযে সংসারের কাহিনী, পুজোপার্বণ-ব্রতকথা, লেখাপড়ার ব্যাপার, কিন্তু আজ সব উল্টো। কোথায় কবে কোন দলে সুরমা কেমন অভিনয় করেছে, তারই বিবরণ। ফুলের মালা আর হাততালির বহরের নিখুঁত বর্ণনা।

এর মধ্যেই ফটোর গোছা হাতে করে সুকান্ত ফিরে এল। অ্যালবাম একটা আছে, কিন্তু তাতে বেমানান দু একটা ফটো রযেছে। শিক্ষানবীশ ফটোগ্রাফারের আনাড়ি হাতের তোলা। সুকান্ত অ্যালবাম থেকে বাছাই করে এনেছে। অপেক্ষাকৃত ভালো জিনিস। যাতে অপছন্দ না হয চণ্ডীবাবুর, মুখ না ফেরায়।

ফটোগুলো অনেকক্ষণ ধরে চণ্ডীবাবু নিবিষ্টচিত্তে দেখল। চোখ কুঁচকে, ভ্রূ বাঁকিযে, ঠোঁট চেপে। তারপর ওরই মধ্য থেকে গোটা তিনেক বেছে নিযে নিজের জামার পকেটে ফেলে দিযে উঠে দাঁড়াল।

—আজ উঠি সুকান্তবাবু, কাল সকালেই এগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেব, দিন সাতেকের মধ্যেই পাকা খবর পেয়ে যাবেন।

—দেখবেন দয়া করে। সুকান্ত দুটো হাত যোড় করল। বিনয়ে বিগলিত।

সুরমার মনে পড়ে গেল। ঠিক এক ভঙ্গি, এক গলার স্বর।

পাত্রী দেখে বরপক্ষরা উঠে যাবার সময় সুকান্ত ঠিক এইভাবে এগিযে যেত। এমনি ঘাড় কাত, এমনি ভিজে ভিজে গলা। কিন্তু তাতে কোন সুরাহা হয়নি। রূপ আর রূপায সেতুবন্ধন সম্ভব হযনি বলেই লোকেরা পিছিযে গিযেছে। কেউ কেউ সোজাসুজি বলেই গিয়েছে মুখের ওপর। অন্যেরা পোস্টকার্ডকে শিখণ্ডী করে মনের কথা জানিযেছে।

কতদিন দেখাশোনার এ টানাপোড়েন চলত ঠিক নেই, উদ্ধার করল পাড়ার প্রীতি। কোথাও কিছু নেই, কি একটা সিনেমার বইয়ে ছোটখাট একটা পার্ট করে পাড়ায় তুমুল আলোড়ন তুলল। রাতারাতি। বুড়োর দল ক্ষেপে অস্থির, ছোকরারা জয়ধ্বনি। এমন বেমক্কা পাড়ায় আর্টিস্টের উদ্ভব হওয়া পঙ্কে পঙ্কজের জন্ম নেওয়ারই সামিল।

আলোড়ন উঠল বটে, কিন্তু সে আলোড়ন শুধু চারপাশের জলকেই ঘোলাটে করে তুলল, পদ্মের পাপড়ি রইল অমলিন। বরং প্রীতির দরজায় গড়পড়তা দৈনিক গোটা দুই বিরাটায়তন গাড়ি এসে দাঁড়াতে শুরু করল। ঝলমলে পোশাকে, উগ্র প্রসাধনে নিজেকে সাজিয়ে হিলের শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে প্রীতি গাড়িতে গিয়ে উঠতে লাগল। ছোকরারা বলল, আর মাস কয়েক, তারপর জোনাকির এই স্বল্প দীপ্তি রূপান্তরিত হবে তারকার অম্লান জ্যোতিতে।

বুড়োরা বলল, হারাধন বসাকের মেয়েটা অধঃপাতে গেল। নিজে তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলেগুলোরও যে মাথা ঘুরিয়ে দিল, এটাই আরো আক্ষেপের।

ঠিক এমনি সময়ে কথা তুলল মিনতি, সুরমার বৌদি। প্রথমে ফিস-ফিসিয়ে সুকান্তর কানে কানে, নিরালা শয়নকক্ষে, আট-ঘাট বন্ধ করে, তারপর একদিন সুরমার সামনেই বলল।

লোক তো ওই তিনটি। শ্বশুর-শাশুড়ীর বালাই নেই, শ্বশুরকুলের গুরুজনও কেউ নয়। কর্তা বলতে সুকান্ত। সব ভারই ওর ওপর।

প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও, সুকান্ত রাজী হয়ে গেল। অন্তত বিয়ে দেবার হাঙ্গামা থেকে তো নিশ্চিন্ত। বিয়ে ঠিক হলেই করকরে টাকার গোছা বের করতে হ'ত, সুকান্তর তিল তিল করে জমিয়ে তোলা তহবিল থেকে। বেহালায় বহু কষ্টে ছোটখাট একটা প্লট

কিনে রেখেছে, সুযোগ-সুবিধা পেলেই সাড়ে তিনখানি ঘরের একটি ভদ্রাসন তুলবে, গোপন বাসনা তাই। সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

অবশ্য আত্মীয়-স্বজনদের কথা ভাববার আছে। বাড়ি বয়ে উপদেশ দিয়ে থাকে। চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হচ্ছে সে বিষয়ে সাবধানবাণী।

কিন্তু সুকান্তই বা কি করবে? বয়স হয়েছে মেয়ের, নিজের ভালমন্দ দেখতে শিখছে, এখন তার পথে বাধা দিতে গেলে সে শুনবেই বা কেন? আত্মীয় পরিজন পড়শিদের মুখ বন্ধ করার পক্ষে এই যথেষ্ট।

সুরমাও ঠিক গররাজী নয়। মা-বাপ নেই, ঢিলে-শাসন সংসারে অযত্নে পুঁই ডগার মতন আপনিই বেড়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম বিয়ের চেষ্টা হয়েছিল। এদিক ওদিক থেকে দু একজন দেখতেও আসছিল। চেহারাও নিন্দার নয়। নাকমুখের চটক আছে, শক্তসমর্থ শরীর। তবে খরচ করতে নারাজ। প্রথমেই নেই নেই ভাব, সোমত্ত বোন গলায় পড়েছে, দম বন্ধ হয়ে আসার দাখিল। কথার ধরন দেখে পাত্রপক্ষ পিছিয়ে যেতে শুরু করল। না হয় দেবে-থোবে কম, তা বলে একেবারে বিনা-সুতোর কারবার? শাঁখা-সিঁদুর ছুঁইয়ে! আজকালকার বাজারে তা কখনো হয়? ঘর-খরচা দিয়ে বিয়ে হবে ছেলের! বেশ তো অনেক না দিতে পারেন, সাধ্যমত দিন। সোনার ভরি কমান, ছেলের নগদ। কিন্তু নিখরচায় কি হয় এসব!

একেবারে নিখরচায় সুকান্ত হয়তো করতে চায়নি, কিন্তু গোড়া থেকে এমন সুঁতো-টান করলে মাছ ডাঙ্গায় উঠবে কি করে?

মা যখন মারা যান, সুরমার মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু বাপ যখন চোখ বুজলেন, তখন এমন কিছু খুকি নয় সুরমা। বয়স আন্দাজে বেশ বুঝতে শিখেছে। শোক পাওয়া, ঘা খাওয়া মেয়েরা একটু বেশিই বোঝে। একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন না তিনি। মেয়ের বিয়ের জন্য

কিছু টাকা রেখেও গিয়েছিলেন। মাস গেলে মাইনে এমন কিছু ছিল না, কিন্তু উপরি ছিল। মদের দোকানের বড়বাবু। একটু এদিক ওদিক করতে পারলেই কাঁচা পয়সা। লুকোছাপা করতেন না, স্পষ্টই বলতেন বাড়িতে এসে। ছেলেমেয়ের সামনে, বৌমার সামনেও।

কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে সুরমা বলবেই বা কি করে! কোথায় গেল জমানো টাকা, তাই নিয়ে দাদার সঙ্গে হাতাহাতি করবে, তর্কের ঘূর্ণি তুলবে!

তা ছাড়া সুকান্ত ওর মতও নিয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে মোলায়েম ভাষায়। অন্য স্বাধীন দেশে ছেলেমেয়েদের নিজের মনের মত পথে চলতে দেওয়া হয়, তার নজিরও দিয়েছে।

এমন হবার কথা নয়। সুকান্তর হিসাব ঠিকই ছিল, সেইজন্যই যখনই কোন ভদ্র দল এসেছে সুরমাকে নিয়ে যাবার জন্য, সুকান্ত বাধা দেয়নি। অভিনয় হচ্ছে উচ্চ স্তরের শিল্প, অভিনয় করার ক্ষমতা সকলের থাকে না, কাজেই যাবে বই কি সুরমা, নিশ্চয় যাবে। কেবল দলটা যেমন ভদ্র, তেমনি টাকাটাও ভদ্রগোছের হওয়া উচিত। গুনে গুনে সুকান্ত টাকা নিয়েছে, নিজে রাখে নি, সুরমাকে সমস্ত ফেরত দিয়েছে। ওর রোজগারের টাকা, এ টাকা আর কারো ছোঁবার অধিকার নেই।

সুরমা না হয় রাজী হলো, কিন্তু এমন কে উদার হৃদয় ডিরেক্টর আছেন, কনট্রাক্টের ফর্ম হাতে এগিয়ে এসে বরণ করে তাকে স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে তুলবেন? এ লাইনে জানাশোনা যে কজন ছিল সুকান্তর, সকলকেই কথাটা বলা হ'ল। ঘাড় নেড়ে আশ্বাস দিল সকলেই, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কাজ আর এগোল না।

হাল ছেড়ে আবার বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ করার মুখে সুকান্ত খবর পেল। ও-সব বাজে লোকের কর্ম নয়, যদি সত্যিই বোনকে

সিনেমায় দিতে চায় তো পরাগ পিকচার্সের চণ্ডী ঘোষালের কাছে গিয়ে দাঁড়াক। বিশ বছরের ওপর রয়েছে এ লাইনে। ওর দৌলতে কত গুবরে পোকা প্রজাপতি বনে গেল, কত চাকরানী প্রমোশন পেয়ে রাজরানী।

বহু কষ্টে চণ্ডী ঘোষালের আস্তানা মিলল। সুকান্তর বরাত। বাড়িতে নেই চণ্ডীবাবু। কখন থাকেন বলা কঠিন। রাতে ফিরবেন কি না, ঠিক-ঠিকানা নেই। পর পর তিন দিন সুকান্ত এলো অফিস-ফেরত। চারদিনের দিন দেখা হয়ে গেল। কোঁচানো ধুতি, হরিণ-শিঙের ছড়ি ঘুরিয়ে বাইরে বেরোচ্ছিল, সুকান্তকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

সকাল থেকে লোক আসার কামাই নেই। হরেক রকমের লোক। নানান বয়সের। কেউ কেউ ঘরে ঢুকে হঠাৎ পা জড়িয়ে ধরেছে, আমাকে বাঁচান।

চণ্ডী খিঁচিয়ে উঠেছে, তার আগে পা ছেড়ে আমায় বাঁচাও দিকি নি। আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে যে পড়ে মরতাম।

সেই ধরনেরই কিছু একটা মনে করে চণ্ডী মুখ-চোখের ভাব বদলাল না, কি মশাই, পার্ট করতে চান সিনেমায় তো? আজ হবে না, আর একদিন আসবেন।

—আমার নিজের জন্য নয়।

—বন্ধুবান্ধবদের জন্য তো? ওই একই কথা। পরে আসবেন।

—আমার বোনের জন্য এসেছিলাম।

বোনের জন্য। চণ্ডী ঘোষাল ঘুরে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে দেখল সুকান্তর আপাদমস্তক। ভাইয়ের মাপকাঠিতে বোনকে জরিপ করার প্রয়াস।* মেয়েও বড়ো কম আসে না এ লাইনে, তবে চণ্ডী ঘোষালের

কাছে যারা আসে, তারা বেশির ভাগই বস্তিবাসিনী কিংবা আরো অধঃ-পতিত সমাজের বাসিন্দা। ভদ্রঘরের মেয়েরা সোজা ডিরেক্টর কিংবা প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করে বড়লোকের সুপারিশপত্রের মাধ্যমে।

ফিরে এসে চণ্ডী ঘোষাল তক্তপোশে বসলো, কি ব্যাপার বলুন তো? বোনটিকে দেখতে কেমন? ফিল্ম ফেস আছে? গানের গলা? চেহারার বাঁধুনি?

সুকান্ত এক কথায় সব প্রশ্নের উত্তর দিল।

—আপনি যদি দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেন গরীবের বাড়িতে তো নিজের চোখেই দেখে আসতে পারেন। আমি আর কি বলবো!

কিন্তু চণ্ডী ঘোষালের সন্দেহ গেল না। এমন ব্যাপার এর আগেও হয়েছে। মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে নামকরা গলিতে। সাজিয়ে গুজিয়ে মেয়েকে এনে বসালে হবে কি, চোখের কোলের কালি কাজলে ঢাকে নি, চটুল চাউনিতেই জাতের নিশানা। পালিয়ে আসতে চণ্ডী পথ পায় নি।

তবু কি ভেবে চণ্ডী ঘোষাল উঠে তাকের ওপর থেকে এক ডায়েরি বের করল। সুকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দিন ঠিকানাটা লিখে। সময় করে একবার না হয় যাবই এখন বেড়াতে বেড়াতে।

সুকান্ত কৃতার্থ। ঠিকানা লিখে নমস্কার করে বাইরে এসে দাঁড়াল।

চণ্ডী ঘোষাল এক কথার মানুষ। কখনো কথার খেলাপ করে না। ঠিক সাত দিনের মাথায় এসে হাজির।

কড়া নাড়তেই সুকান্ত বেরিয়ে এল। সমাদরে নিয়ে গিয়ে বসালো বাইরের ঘরে। আশা-চিকচিক চোখে একদৃষ্টে চণ্ডীর দিকে চেয়ে বলল,—হলো কিছু?

হবে না মানে? চণ্ডী ঘোষাল আলতো গোঁফের ওপর হাত বোলাল, চণ্ডীরাম নিজে হাতে করে যখন ফটো নিয়ে গেছে, তখন জানবেন কাজ অর্ধেক হাসিল হয়েই গেছে।

সুকান্ত হাতের আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে বিগলিত হবার ভান করল, তা আর জানি না। এ লাইনে আপনার কথার ওপর কথা বলবার সাধ্য আছে কারুর? সেইজন্যই তো আপনার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

আবেগের মুখেই চণ্ডী ঘোষাল সুকান্তকে থামিয়ে দিল, তবে কথা আছে।

কথা? কথা আবার কিসের? কাজটা করে দেবার জন্য কিছু হাত-খরচা চাই বুঝি? না রোজগারের কিছু অংশ?

—মানে, এতো শুধু প্রথম ধাপ। এর পরে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হবার আগে আপনার বোনকে যেতে হবে স্টুডিয়োতে। ক্যামেরাম্যান পরখ করে দেখবেন ছবি তুলে। তারপর ডিরেক্টরও দেখবেন একবার। চলন বলন সব একবার পরীক্ষা করে নিতে হবে বই কি! লাখ লাখ টাকার খেলা, বাজিয়ে নেবে না?

তা তো নিশ্চয়। প্রথম সুযোগটা করে দিলে চণ্ডী ঘোষাল, এরপর মেয়ের বরাত। তবে সুকান্ত ভরসা রাখে বোনের ওপর। আনকোরা তো আর নয়। বড় বড় স্টেজে প্লে করে এসেছে, জমজমাট হলে। তবে সে ছিল কায়ার খেলা আর এ ছায়ার মায়া।

চৌকাঠের কাছে গিয়ে সুকান্ত বোনকে ডাকল। বেশ চড়া গলায়। উদ্দেশ্য শুধু বোনকে ডাকাই নয়, বোনের বৌদিকেও জানান। শুধু সুরমারই স্বপ্ন সফল হবে না, মিনতিরও সাধনার সিদ্ধি। দুজনেই খুশি হবে।

এলো চুলে বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে সুরমা এসে দাঁড়াল, কিন্তু পর্দার এপারে আসার আগেই সুকান্তর চোখের ইশারায় থেমে গেল।

কি মুশকিল, তীরে এনে তরী ডোবাবার মতলব। এমন অগোছাল পোশাকে বাইরের লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আছে। তাও আবার আসন্ন শুভলগ্নে।

সুকান্ত বোনের পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, এইভাবে যাস নি বাইরে। চুল-টুল ঠিক করে আয়। চণ্ডী ঘোষাল এসেছে, পরগ পিকচার্সের।

সেটুকু বুদ্ধি সুরমার আছে। দাদার আচমকা ডাকে খেয়াল করেনি প্রথমে, কিন্তু পর্দার কাছে এসেই বুঝতে পেরেছে। চোখের ইশারায় কাজ হয়েছে। সামনে আর পা বাড়ায় নি সুরমা।

মিনিট পাঁচেক। সুকান্ত আর সুরমা পাশাপাশি বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। এই অল্প সময়ের মধ্যে শুধু চুলই আঁচড়ায় নি সুরমা, মুখে পাউডারের হালকা প্রলেপও দিয়েছে, দুগালে রুজের অস্পষ্ট আভা ও লালিমা যেন ধার করা নয় নিজেরই, এমন একটা সন্দেহ জাগায়। পরনের শাড়িটাও বদলেছে। হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

চণ্ডী ঘোষাল আর একবার বলল কথাটা। সুরমার সামনে। ঠিক হল দেরি নয়, দিন দুয়েকের মধ্যেই ব্যবস্থা করতে হবে। অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে বোনকে নিয়ে যাবে স্টুডিয়োতে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, একটা গতি হবে সুরমার।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কথা হলো দুজনে। সুকান্ত আর মিনতি।

মিনতি মুচকি হাসলো, কিগো কেমন মতলব দিয়েছি? সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুকান্ত ঘাড় নাড়লো, আরে দাঁড়াও, সবে তো কলির সন্ধ্যে। ভালোয় ভালোয় পরীক্ষায় উতরে যাক। তবেই না!

—তোমার বোন পরীক্ষায় ঠিক উতরোবে, ভেবো না। শক্ত জল,

বাঘব বোয়ালও যেমন আটকায়, চুনো পুঁটিব পালাবাব পথ নেই। কা'ল বিকেলে গিয়েছিলাম যে প্রীতিদেব বাড়ি।

বাব চাবেক চেষ্টা কবে সুকান্ত সিগাবেট জ্বালালো। পোড়া কাঠি-গুলো কুড়োতে কুড়োতে ঘাড ফিবিয়ে বলল, তাই নাকি।

—প্রীতিব মা আব দিদিব কি কান্না। মেয়ে ঠিকমতো বাড়িতেও আসে না। যেদিন আসে সেদিন মদে চুব।

—অ্যাঁ? সুকান্ত বীতিমত চমকে উঠলো, এমন মেয়েকে ঘবে ঢুকতে দেয় এখনো?

—বাপ বিদেশে, মেয়েছেলেব সংসাব, কে শক্ত হবে বলো? অব ও মেয়েও কিছুদিন পবে আব ফিবছে না ঘবে। শিকল কাটা টিয়ে দাঁড়েব মোহ কাটলো বলে।

জুতসই হয়ে সুকান্ত মিনতিব পাশে বসলো, কিন্তু ছবিব ব্যাপাব কতদূব?

মিনতি চোখ ঘোবালো, বাখো বাখো, অত সহজ হলে ষব ভাবনা ছিলো না। সব পাঁচীই পঙ্কজিনী হয়ে যেতো। দুটো বইয়ে তা মেটে নেমেছে, একটায় চাকবানী আব একটায় নায়িকাব পিসতুতো বোন। আড়াই মিনিটেব পার্ট।

—তাতেই এই? সুকান্ত অবাক। হাত দিয়ে ধুতিব ভাজে জমা ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, জাতও গেলো, পেটও তো ভবলো না।

—এই পেশাব তো এই মজা। একেবাবে বাধিকাব অবস্থা। কুল খোয়াতে হয়, মানও অটুট থাকবে না, অথচ শ্রীকৃষ্ণ নাগালেব বাইবে দ্বাবকায়।

শেষ টান দিয়ে সুকান্ত সিগাবেটটা হাত বাড়িয়ে বাইবে ফেলে দিলো। মিনতিব দিকে একটু হেলে বলল, কিন্তু সুষমা আবাব যে

ধরনের মেয়ে, তেমন সুবিধা না হলে হয়তো যাবেই না স্টুডিওতে। সোমত্ত বোন ঘরে থাকলে বিয়ের চেষ্টাও একটা করতে হবে। তা হলে আর উপকারটা কি হলো! মাঝ থেকে কেবল দৌড়োদৌড়ি আর পয়সা খরচই সার।

—ও মেয়ে এলেই অমনি ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে কে? দু গালে রঙ মাখা তো চুন-কালি মাখারই সামিল। সাধ হয় তোমার বোনকে তুমি নিয়ে ঘর করো আলাদা, আমি ওর সঙ্গে এক চালায় বাস করতে পারবো না। মানিকতলার ঘোসেদের বাড়ি বললে লোকে এক ডাকে চেনে। সে বাড়ির মেয়ে হয়ে কাদা মাখতে পারবো না সবাঙ্গে।

মানিকতলায় মিনতির বাপের বাড়ি। এক সময়ে অবস্থা ভালোই ছিলো। কিন্তু এখন নামেই তালপুকুর, আধ ক্রোশের মধ্যে তালগাছ তো নেই, পুকুরের জলের যা বহর তাতে ঘটিও ডোবে না। একশো বছরের পুরোনো বাড়ি সাত শ ভাগ। এক-এক ভাগে আড়াইখানা ঘর আর এক ফালি বারান্দা। নগদ যা ছিলো, সবই উকিলের পেটে।

কিন্তু এসব কথা বলা আর সাপের ল্যাজে পা দেওয়া একই কথা। এখনি মিনতি ফণা তুলে দাঁড়াবে।

সুকান্ত সে দিক দিয়ে গেলো না। বলল, কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না, মেয়ে যে এক ধরনের। আমি তো ভেবেছিলাম ছেলেদের সঙ্গে থিয়েটার করে, নিজের আখের ঠিক গুছিয়ে নিতে পারবে। বড় ঘরের ছেলেও তো থাকে দু-একটা, কিন্তু দেখলে তো কাণ্ড! থিয়েটার চুকলো তো সম্পর্কও চুকলো। মেয়ে আর সে পথ মাড়ায় না। সুরমাকে রাজী করাতে কম বেগ পেতে হয়েছে আমাকে।

মিনতি আর কথা বাড়ালো না। হাই তুলে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

পরীক্ষায় ভালোয় ভালোয় সুরমা উতরে গেল। ছবি ভালোই এলো, গলার আওয়াজ চমৎকার। সামান্য আড়ষ্টভাব রয়েছে, নতুন নতুন ওটুকু থাকেও, ওটা ঠিক কাটিয়ে উঠবে। আনন্দে সুকান্ত সেদিন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরলো।

বেশি নয়, গোটা দুই বইয়েতে নামলেই কাজ হবে। একটা চেঁচামেচির সৃষ্টি করে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলেই হবে। সেটা মিনতি ঠিক পারবে। স্টেজে নেমে অভিনয় করে না বটে, কিন্তু এলেম আছে মিনতির। আজ ছ বছরের ওপর ঘর করছে সুকান্তর। মানুষ চিনতে ওর বাকি নেই।

দিন কুড়ির মধ্যেই সুরমার ডাক এলো। "পান্থশালা" ছবিতে কাজ করতে হবে। দিন পাঁচেকের কাজ। দক্ষিণার ব্যাপারে সুরমার একটু মন খুঁতখুঁতানি ছিলো, কিন্তু সুকান্ত আর মিনতি দুজনে ওকে বোঝালো। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে কখনো! এই তো শুরু। একটু নাম করতে পারলে সুরমা নিশ্বাস ফেলার সময় পাবে না। ডিরেক্টর আর প্রযোজকে উঠান ছেয়ে যাবে।

মাস তিনেক পরেই সুরমা প্রজেকশন দেখলো। ডিরেক্টর ভারি খুশি। ছোট পার্ট, কিন্তু কোন জড়তা নেই, ঠিক ফুটিয়েছে সুরমা। প্রথমবারে অনেকেই ক্যামেরা-কনশাস হয়ে পড়ে, চলাফেরায় আড়ষ্টভাব। প্রথম বইতেই সুরমা সেটা কাটিয়ে উঠেছে।

ডিরেক্টর হাজরা কথা দিলো সুরমাকে, এর পরের বইতে উপনায়িকার পার্ট ওর বাঁধা। দক্ষিণার মাত্রাও বাড়বে।

'পান্থশালা' ছবি শুরু হবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এক কাণ্ড।

কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলেই সুকান্ত পিছিয়ে এলো। হাফ শার্ট

আর ফুল প্যান্ট পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চোখে ফিতে লাগানো চশমা, মাথায় সোলার হ্যাট। পিছনে ছোকরা গোছের একজন।

—এটা কি সুরমা দেবীর বাড়ি?

বাড়ি অবশ্য বাড়িওয়ালার। কটন স্ট্রীটের পুনামচাঁদ আগরওয়ালা। ভাড়া দেয় সুকান্ত গুহ। সুরমা দেবীর কোন এক্তিয়ার নেই। কিন্তু এত সব কথা তো আর সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের বলা চলে না।

সুকান্ত মিহি করলো গলার স্বর, সুরমা আমার বোন। কি দরকার বলুন?

সামনের ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা টেনে বুকে ঝোলালেন, সবুট একটা পা চৌকাঠে তুলে দিয়ে বললেন, দরকারটা তাঁকেই বলবো। দয়া করে ডেকে দিন।

—কি নাম বলবো?

—বলুন মডার্ন স্টুডিয়োর মিস্টার রে এসেছেন।

দুটো চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুকান্ত ভিতরে চলে গেল।

রবিবার। সুকান্তর যেমন অফিসের ঝামেলা নেই, তেমনি সুরমারও শুটিংয়ের বালাই নেই।

রান্নাঘরে মিনতি আর সুরমা মিলে কি একটা নতুন রান্নার আয়োজন করছিলো, সুকান্ত গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

—কে এক মিঃ রে এসেছে দেখা করতে। কি মেজাজ, আমাকে তো পাত্তাই দিল না।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সুরমা উনুনে কড়া চাপাচ্ছিলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মিঃ রে, মডার্ন স্টুডিয়োর?

—ওই রকমই যেন কি একটা বললে। সুকান্ত আমতা আমতা করলো। জামার হাতায় মুখ মুছে বলল, লোকটা কে?

—ও বাবা, সুরমা আঁচল খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, মস্ত বড়ো ডিরেক্টর। 'পথের নেশা', 'কেয়াফুল' সবই তো ওঁর বই। প্রত্যেকটি হিট পিকচার।

—তাই নাকি ? সুকান্ত মনে মনে উৎফুল্ল হলো, কিন্তু তোর কাছে কেন ?

—কি জানি। পান্থশালার সেটেও কদিন গিয়েছিলেন। আমার কাজ দেখেছেন দু দিন।

সুরমা আর দাঁড়ালো না। পোশাক পালটাতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মিনতি সুকান্তর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। চাপা গলায় বলল, দেখো তোমার বোনের বুঝি বরাত খুললো।

সুকান্ত হাসলো, আরে ওর বরাত খোলা মানেই তো আমাদেরও বরাত খোলা। আর কিছুদিন, তারপর একদিন সোরগোল শুরু ক'রো। ব'লো তোমাদের বাপের বাড়ির লোকেরা ছি ছি করছে। এক বাড়িতে সুরমার সঙ্গে থাকা আমাদের চলবে না। পাড়ায় টি টি পড়ে গেছে, পথ চলা দুষ্কর। ও যদি এ বাড়িতে থাকতে চায় ভালো কথা, আমরা সরে যাচ্ছি অন্য কোথাও।

মিনতি আরো সরে এলো সুকান্তর দিকে। গায়ে গা ঠেকিয়ে, ভ্রূ বাঁকা করে বলল, জানি গো জানি। আমাকে আর শেখাতে এসো না। কি করবো আমার মনেই আছে! তাড়াহুড়োর কাজ নয়। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো।

মাঝপথেই মিনতি থেমে গেলো। সুরমা বেরিয়েছে প্রসাধন সেরে। অগুরুর হালকা সুরভি। স্নো-রুজ-পাউডারে পালটে ফেলেছে মুখশ্রী। পরনে দামী সিফন।

মিস্টার রে কাজের মানুষ। ভনিতার বালাই নেই, এদিক সেদিক

কথাবার্তা নয়। একেবারে দরকারী কথা পাড়লেন। ওঁর নতুন বইয়ের বাছাইকরা নায়িকা কেতকী দেবী বোম্বে রওনা হয়েছেন, সুরমার কাজ তিনি দেখেছেন, একটু মেজে-ঘষে নিলে ভালোই হবে। সুরমা কি রাজী আছে?

রাজী! হাতে যেন চাঁদ পেলো সুরমা। কণ্ট্রাক্টের পাতায় টাকার বহর দেখে সুকান্ত নিশ্বাস ফেললো। পাঁজর কাঁপিয়ে এমন বরাত সচরাচর দেখা যায় না। এক ছবিতে অর্ধেক কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেক ছবিতে ডাক।

শুধু সাজপোশাকই নয়, সুরমার চেহারাও বদলে গেল। ভোর সাড়ে সাতটায় বেরোয়, বাড়ি ফেরে দশটা। কোন কোনদিন রাত কাটিয়ে ভোরেব দিকে।

মিনতি কিছু বলবার আগে সুবমাই বললো।

রাত সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরে সুরমা আয়নার সামনে বসে ঘষে ঘষে মেক-আপ তুলছিলো, দবজায় শব্দ হতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো মিনতি এসে দাঁড়িয়েছে।

দবজা খুলে দিয়েছিলো বাড়ির বুড়ী ঝি মোহিনী, সুকান্ত আর মিনতি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ ঘুমচোখে যে উঠে এলো মিনতি!

ভালোই হয়েছে, কথাটা কদিন বলি বলি করেও বলা হচ্ছে না সুরমার, অথচ না বলে নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে।

—শোনো বৌদি! সুরমা চাপা গলায় ডাকলো।

ঠিক এই সুযোগেরই মিনতি অপেক্ষা করছিলো। সকাল থেকে কথাগুলো অনেকবার আউড়েছে নিজের মনে মনে। আর নয়, এবার স্পষ্ট

করে বলবে। এভাবে থাকা আর সম্ভব নয়। সুরমার না হয় লোক-লজ্জার ভয় নেই, সমাজের বালাই নেই, কিন্তু মিনতি তো তেমন ঘরের মেয়ে নয়! লোকে যে ওর গায়ে থুথু দেবে, মাথা হেঁট হবে সমাজে।

মিনতি কাছে যেতেই সুরমা চেয়ার ঘুরিয়ে বসলো, কিছু মনে করো না বৌদি, আমার বলতে কেমন লজ্জা লজ্জা করছে, অথচ না বলেও উপায় নেই।

মিনতি ভ্রূ তুললো। সুরমার আবার বলার কি আছে! মাঝরাতে কপট ঘুম ছেড়ে কথা বলবার জন্য তো মিনতিই উঠে এসেছে।

—আমার এখানে বড়ো অসুবিধা হচ্ছে বৌদি। স্টুডিয়োগুলো বড্ড দূরে হয়ে পড়েছে। যেতে আসতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তা ছাড়া ঠিক এ পাড়ায় আমাদের থাকলেও চলে না। অন্য সবাই ঠাট্টা করে, মানে ঠিক অ্যারিস্ট্রোক্রেটিক পাড়া বলতে যা বোঝায়, তা তো এটা নয়।

কথা থামিয়ে সুরমা ভিজে তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটের রঙ তুলতে লাগলো। মিনতির মুখের রঙ কিন্তু এমনিতেই শুকিয়ে গেলো। কথাগুলো ঠিক শুনেছে তো! সারা জন্ম গেলো বিপিন সাধুখাঁ লেনে, আর এতদিন পরে বুঝি এ পরিবেশ বাতিল হয়ে গেলো! পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে এ গলি থেকে বের হলে?

ভালোই হলো, শাপে বর। সাপেরও দফা নিকেশ অথচ লাঠিও অটুট। বদনামের ভাগী হ'তে হলো না মিনতিকে। সুরমাই থাকতে চাইছে না একসঙ্গে তো সে কি করবে!

কিন্তু তবু তেরচাভাবে মাছের কাঁটা দাঁতের ফাঁকে বিঁধে থাক'র মতন কোথায় একটা কাঁটা ফুটে রইলো। নড়তে চড়তে প্রাণান্তকর ব্যথা। রসিয়ে রসিয়ে নিজের থেকে বলবে যে কথা, সে কথা অন্য

লোকের মুখ থেকে শুনতে কখনো ভালো লাগে! আগ বাড়িয়ে লাঠি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে উলটে তারই হাতে সেই লাঠিতে মার খাওয়ার মতন। এ জ্বালা সহজে যাবার নয়।

—আমি আর সুপ্রিয়াদি বালিগঞ্জে এক ফ্ল্যাট ঠিক করেছি, সামনের মাস থেকে উঠে যাবো। আমার বাপু দাদাকে বলতে কেমন লজ্জা করে, তুমিই বলে দিও, বুঝলে?

আয়নার খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুরমা আঁকা ভ্রূ তুলতে লাগলো। খুব সাবধানে। একটু অন্যমনস্ক হলে ভ্রূর রং গালে কপালে লেগে যাবে।

তার চেয়েও বুঝি বেশি সাবধানে পা টিপে টিপে মিনতি পিছিয়ে এলো। মুখ দেখে মনে হলো সুরমার ভ্রূর যত কালি কোন ফাঁকে ওর মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। সারা রাত ধরে ঘষলেও এ কালি বুঝি উঠবে না, সারাটা জীবন ধরে ঘষলেও নয়।

সুরমা উঠে গেলো বটে, কিন্তু সম্পর্ক ছাড়লো না। সুযোগ সুবিধে পেলেই আসতে লাগলো। একেবারে খালি হাতে নয়। ফল মিষ্টি তো আছেই, মাঝে মাঝে দামী শাড়ি মিনতির জন্য, সুকান্তর জন্য পাঞ্জাবীর গরম কাপড়।

সুকান্ত বাড়িতে থাকে কম। বাড়ি শুরু হয়েছে বেহালায়। অফিস-ফেরত রোজ একবার করে যেতে হয় তদারকে। ঠিকেদারকে বিশ্বাস নেই। আড়াই ইঞ্চি দেওয়াল কমিয়ে দেড় ইঞ্চি কিম্বা সেগুন বলে বেমালুম জারুল চালিয়ে দেবে। কাগজে এদিক ওদিক বোনের নাম নজরে আসে, পোস্টারে লীলায়িত ছবি। আত্মীয়পরিজন তারিফ করে সুকান্তর। বুকের পাটা আছে। বোন বিপথে পা বাড়িয়েছে বলে ঘরেও তার ঠাঁই হয়নি। আজকালকার তেমন ছেলে হলে ওই

বোনকে শুধু পুষতোই না, ওর উপর নির্ভরও করতো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাতও পাততো।

সুকান্ত ভেবে রেখেছে। তেমন তেমন হলে ঠিক চাইবে টাকা। দাক্ষিণ্য নয়, ধার। পাই পয়সাটি পর্যন্ত গুনে গুনে ফেরত দেবে। ঋণ রাখবে না। একতলা বাড়ি আরম্ভ করেছে, বোনের সাহায্য পেলে আড়াইতলার চেষ্টা।

কিন্তু যার জন্য এত করা, তারই কেমন ঢিলে ভাব। আগে মিনতি বাড়ির নকশা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো দিনের পর দিন, আজ সিকি তৈরি বাড়ির দিকেও খেয়াল নেই। বাড়ির ভিত্তি স্থাপনের সময় কি নাম হবে বাড়ির এ নিয়ে মিনতির ভাবনার অন্ত ছিলো না, কিন্তু ছাদ ঢালাই হয়েছে সেদিকে মনও নেই। জিজ্ঞাসা করলে খিঁচিয়ে উঠেছে। অত লাফালাফি করার কি দরকার! বাড়ি শেষই হোক আগে, নাম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

সুরমার সঙ্গে মাঝে মাঝে সুকান্তর দেখা হয়েছে। চালচলন আবরণ আভরণই শুধু বদলায়নি, চেহারাও পালটেছে। আরো নিটোল হয়েছে গড়ন, রং বেশ ফরশা, দুগালের লালিমা যে রুজ-সঞ্জাত নয়, তা বেশ বোঝা যায়।

হবে নাই বা কেন? মিনতি আক্ষেপ করে, মুঠোমুঠো টাকা আনছে দিনের পর দিন। ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই। ভালো জিনিস খাচ্ছে দুবেলা, বাজারের সেরা জিনিস কিনছে খুশিমত।

শেষদিকের কথাগুলোয় কান্নার ছিটে।

ইদানীং সুকান্ত লক্ষ্য করেছে। সিনেমা দেখতে দেখতে আগে মিনতি ঘৃণায় নাক সিঁটকাতো। নায়িকা সেজে সুরমা যেখানে নায়কের সঙ্গে পূর্ব রাগের পালা জমাতো কিংবা বিবাহোত্তর প্রেম,

মিনতি মুখ ফেরাতো, কি বেহায়াপনা, ছি, ছি! একটু লজ্জাও করে না ঠাকুরঝির! আজকাল কিন্তু মন দিয়ে সব দেখে। ঘাড় টান করে চোখ না সরিয়ে। শুধু সুরমার অভিনয়ই নয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার শাড়ি পরার ধরন, ব্লাউজের নবতম ফ্যাসান, নতুন ডিজাইনের কর্ণাভরণ।

সুকান্ত কিছু বলতে গেলে তর্ক করে মিনতি, বারে ঠাকুরঝির কি দোষ! ডিরেক্টর যেমন বলবে, যেমন সংলাপ, তেমনি তো করবে। তারপর স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছে, জানো ঠাকুরঝি গাড়ি কিনবে একটা। লাল রংয়ের, তাই বলছিলো। আমার বাপু লাল রংটা ভালো লাগে না, আমি বলেছি বটল-গ্রীনের কথা। আজকাল কেমন আহভরি স্টিয়ারিং হয়েছে!

সুকান্ত কোন উত্তর দেয় না। মনে মনে হিসাব কষে। বেশি নয় আর হাজার কয়েক টাকা হলেই দোতলাটা উঠে যেতে পারে। গোটা চারেক ঘর, আর তিনতলায় ছোট একটা ঠাকুর ঘর। তাহলে একতলাটা ভাড়া দিয়ে, ওরা দোতলায় গিয়ে থাকতে পারে। মিনতিকে দিয়েই বল'তে হবে সুরমাকে। এই বেলা। সুরমা আরো বড় হয়ে গেলে আর নাগালই পাওয়া যাবে না। আজকাল আসা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। সুরমা বলে কাজের চাপ, কিন্তু তা যে নয় তা ভালো করেই সুকান্ত জানে। সুরমা এখন গ্রহান্তরের বাসিন্দা। বিপিন সাধু খাঁ লেনে তাকে নেমে আসতে হলে, অনেক কানা গলি পার হয়ে আসতে হয়, অনেক গা-ঘিনঘিন পথের বাঁক।

সেদিন অফিস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। বন্ধ হবার কথা নয়, কিন্তু কর্মকর্তারা খোস মেজাজে ছিলেন, সবাই মিলে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, তথাস্তু। অফিস টিম ফুটবলে জিতে কাপ পেয়েছে। তারই সম্মানে।

সুকান্ত এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না। সারাটা দিন বেহালায় থাকতে পারলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। মজুরদের ফাঁকি বন্ধ হবে, মিস্ত্রিদের ঢিলে-গতি। মিনতিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। ট্রামে বাসে ভিড় কম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। বসবার ঘর, শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুম, ফালি বারান্দা, ঠিক যেমনটি মিনতি ফরমাশ করেছিলো। মিনতির কোন ওজর শুনবে না আজ, ঠিক নিয়ে যাবে টেনে।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে গিয়েই সুকান্ত থেমে গেলো। কপাট ভেজানো। হাত দিতেই খুলে গেল। ভিতরে পা দিয়েই যেন ভূত দেখলো সুকান্ত। অতর্কিতে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে গেলো।

সামনের চেয়ারে চণ্ডী ঘোষাল, গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, দুপায়ের ফাঁকে হরিণ-শিংয়ের লাঠি। একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিলো, সুকান্তর গলার আওয়াজে চমকে উঠে বসলো।

—কি ব্যাপার, আপনি? সুকান্ত অবাক গলায় প্রশ্ন করলো।

—আর বলেন কেন, চিঠির ওপর চিঠি। মরবার সময় নেই, দুখানা নতুন বই কর্তারা শুরু করেছেন, এদিকে আমার প্রাণান্ত।

—চিঠি?

—এই দেখুন না। পকেট থেকে চণ্ডী ঘোষাল দোমড়ানো একটা পোস্টকার্ড বের করলো। এগিয়ে দিলো সুকান্তর সামনে।

একবার চোখ বুলিয়েই সুকান্ত বসে পড়লো চেয়ারে। বসার ধরন দেখে মনে হলো চেয়ারে নয়, পথেই বুঝি বসেছে। আঁকাবাঁকা হাতের লেখা। এ অক্ষর খুব চেনা সুকান্তর। মেসে থাকতে সপ্তাহে একখানা করে এই হাতের চিঠি আসতো। কিন্তু ভাষার আকাশ পাতাল তফাত।

সুকান্ত আর ভিতরে ঢুকলো না। কি দরকার! সেজেগুজে এখানেই তো আসবে মিনতি। সদ্যতোলা ফটোর গোছা হাতে নিয়ে।

নবজাতক

জানলা দিয়ে তেরচা ভাবে রোদটা চোখে এসে পড়তেই মাধবী চোখ খুললো। সবটা নয়, আধখোলা অবস্থায় নজর বুলালো আকাশের দিকে। বেলা কত সেটা জরিপ করার দৃষ্টি নিয়ে।

রোদের ছটা আসতে কোন বাধা নেই। আকাশ-আটকানো অট্টালিকার সার নয়, গাছপালারও বালাই নেই এদিকটা। মোড় পর্যন্ত একতলা বস্তির সার। খোলার চাল আর ঢেউ টিনের খেলা। পাঁচমিশুলী বাসিন্দা। গোয়ালা আছে, রিকশাওয়ালা আছে, মজুর, ফিটার থেকে আরম্ভ ক'রে কামার-কুমোর। রাত বারোটা অবধি হৈ-হল্লার অন্ত নেই। এ পাড়ার ভদ্রলোকেরা একজোট হয়ে অনেকবার চেষ্টা করেছে। দু একদিন গোলমাল কম। তারপর আবার যে কে সেই। ক্রমে ক্রমে ভদ্রবাসিন্দাদেরও গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছে। আহা, সমস্ত দিন খাটে, সেই অনুপাতে খাওয়া জোটে না ভালো করে। একটু আমোদ আহ্লাদ না করলে বাঁচবেই বা কি ক'রে! অবশ্য ভালো কাজও করে। দাঙ্গার সময় দল বেঁধে গলির মুখে পাহারা দিয়েছিলো সবাই। পাড়ার বাবুরা দরজায় তিন তিনটে তালা এঁটে চিলে কোঠায় বসেছিলো বন্দুক নিয়ে। তেমন তেমন দেখলে তবে ট্রিগার টিপবে। এ ছাড়া সেন-ভিলায় যেবার আগুন লাগে, সেবার এরাই ছুটে এসেছিলো। টেপাকল থেকে বালতি বালতি জল এনে ঢেলেছিলো খড়ের গাদায়। নয় তো, গোয়ালঘরের চালায় যে আগুনের

শুরু তার শেষ হতো বোধ হয় আড়াইতলা বাড়ি আধপোড়া ক'রে।

—বৌমা, বৌমা!

মাধবী ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো।

খুব আস্তে শিকলের শব্দ। শাশুড়ী গঙ্গাস্নানে যাবেন তারই সঙ্কেত। বৌমা উঠে দরজা বন্ধ করবে, নযতো এত ভোবে দরজা হাট ক'রে খুলে বেখে গেলেই তো সর্বনাশ। ঘড়া ঘড়া মোহর না হয নেই, কিন্তু রান্নাঘরের কোণে বাসন তো রয়েছে জড়ো করা। আলনায ছেঁড়া হোক, পুরোনো হোক, কাপড়ও রয়েছে দু একখানা। নিযে গেলেই তো কপাল চাপড়াতে হবে। এ বাজারে নতুন ক'রে কিছু করাও দুষ্কব।

ঘুমচোখে মাধবী উঠে বসলো। ভালো ক'বে আঁচলটা জড়িয়ে নিলো গায়ে। পাশে মানুষ নেই, কিন্তু বালিশ রযেছে সাজানো। সতীনাথের আবাব একটা বালিশে কুলোয না। মাথাব যেমন চাই, তেমনি পাশেরও একটা দবকাব। এক নম্ববেব আয়েশী। অথচ ভাবতেও মাধবীর অবাক লাগে। এই লোকটা সরু একটা টেবিলে গাযের কাপড় পাকিয়ে মাথায দিযে দিব্যি বাত কাটিযে দেয। নাইট ডিউটি হ'লে হবে কি, মাধবী সব শুনেছে সতীনাথেব কাছে। বড জোব রাত দুটো আড়াইটে, তাবপব যে যাব সবাই চেযাব কিংবা টেবিল জুড়ে লম্বা। গাযের কাপড় না থাকে, তো পুবনো খবরেব কাগজের বাণ্ডিল রয়েছে।' নিদেন পক্ষে বাঁধানো খাতাব গোছা।

—বৌমা!

মাধবী একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিযেছিলো। তক্তপোশে পা ঝুলিযে সতীনাথের কথা ভাবছিলো। শাশুড়ীর কথায চমক ভাঙলো।

—যাই মা।

ভালো ক'রে চোখ মাধবী তখনও খোলেনি। চোখ খুললেই ঘুমের আমেজ কেটে যাবে। হাতড়াতে হাতড়াতে খিল খুললো।

—দরজাটা দিয়ে তুমি একটু গড়িয়ে নাও মা। সতুর আসতে তো সেই নটা।

কথা শেষ করে শাশুড়ী আর দাঁড়ালেন না। কমণ্ডলু হাতে নিয়ে মালা জপ করতে করতে পথে পা দিলেন। দু একদিন নয় আজ ছ বছর ধরে মাধবী দেখে আসছে। ভোর থাকতে রোজ গঙ্গাস্নান। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, একটি দিন কামাই নেই।

সতীনাথের যেদিন নাইট ডিউটি থাকে না, সেদিন সেই উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। বউকে আর জাগায় না। কোন কোনদিন এমনও হ'য়েছে দুজনেই জেগে গল্প করছে, মায়ের গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চুপ। মাধবী জেগে থাকলেও ওঠে নি। ইশারায় সতীনাথকে উঠতে বলেছে।

—না বাপু, তুমি ওঠো, আমার ভারি লজ্জা করে। চুলটুল ঘেঁটে যা ছিরি করেছো আমার, মা কি মনে করবেন!

কি আশ্চর্য, পরপুরুষ তো আর নই। রীতিমত অগ্নিসাক্ষ্য ক'রে সাতপাকের সম্বন্ধ। ফিসফিস ক'রে সতীনাথ বলেছে, অবশ্য সেই সঙ্গে উঠেও পড়েছে বিছানা থেকে। বুড়ো মা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন উঠানে।

সতীনাথ ফিরে আসতেই কিন্তু মাধবী খিল খিল করে হেসে উঠলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

—কি, এত হাসির ঘটা যে? যত হাসি তত কান্না, মনে আছে তো রামশর্মার সেই উপদেশ।

মাধবী হাসি থামালো না, আঙুল দিয়ে সতীনাথের গালের দিকে দেখালো।

—কি, গালে কি হয়েছে! দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই সতীনাথ অপ্রস্তুত। ছি ছি, কেলেঙ্কারীর একশেষ। দু গালে সিঁদুরের ছোপ। এই নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো মার সামনে গিয়ে! দু একটা কথাও বলেছে। এমন কিছু অন্ধকার নয়। অন্ততঃ টকটকে লাল সিঁদুর চোখে না পড়ার মতন আবছা নয়।

—কিগো তুমি বলতেও পারোনি গালে এমন কাণ্ড হ'য়েছে! মা কি মনে করলেন বলো তো?

মাধবী হেসে লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, কি আশ্চর্য, পরনারী তো আর নই। রীতিমত অগ্নিসাক্ষ্য করে—

কথা আর শেষ করতে পারে না মাধবী, তার আগেই সতীনাথ এসে চেপে ধরে মুখ।

দরজা বন্ধ করে মাধবী আবার বিছানায় ফিরে এলো। ভার ভার লাগছে শরীর। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। শাশুড়ীর ফিরতেও দেরি হবে। শুধু তো স্নান সারাই নয়, ঘাটের ধারে ধারে যত মন্দির আছে সবগুলোতে ঢুকবেন একবার করে। বিগ্রহের মাথায় জল ঢালবেন। গলায় আঁচল জড়িয়ে টিপ টিপ প্রণাম। এটা অবশ্য আগে ছিলো না। বছর তিনেকের ব্যাপার। বিয়ের পর বছর তিনেক শাশুড়ী অপেক্ষা করেছিলেন, তারপরই ব্যস্ত হ'যে পড়েছেন। ব্যস্ত হবারই কথা। বছর শেষ হবার আগেই লোকের কোলে চাঁদপানা ছেলে আসছে কিংবা নরম তুলতুলে মেয়ে। এই তো একেবারে কোণের বাড়ি। অমিয় মজুমদার ছেলের বিয়ে দিলেন আষাঢ় মাসে, পরের

বছর শ্রাবণ ঘোরার আগেই মেয়ে এলো কোল আলো ক'রে। ঘোষাল বাড়িতেও তাই। আজকাল তো দেরি সয় না মেয়েদের। মনে হয় কোঁচড়ে করে বুঝি সন্তান নিয়েই আসে। বিয়ের পালা চুকতে না চুকতে অন্নপ্রাশনের হাঙ্গামা। সবই বরাত। নয়তো এমন স্বাস্থ্য বৌয়ের। নিটোল গড়ন, দুটিতে ভাবও খুব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বালিশ আঁকড়ে ভাবতে ভাবতে মাধবীর গাল দুটো লালচে হ'য়ে উঠলো, লজ্জার ছায়া দু'চোখে।

শুধু শাশুড়ী নিজেই চেষ্টা করেননি, মাধবীও রেহাই পায়নি। মাদুলি আর তাবিজে দুটো হাত ভরে উঠেছিলো।

সীতানাথ ঠাট্টা করতো, ছাপোষা মানুষ, রোজ রোজ নতুন নতুন গয়না তো আর কিনে দিতে পারবো না তোমাকে, তারই সাধ মা বুঝি এভাবে মেটাচ্ছেন।

শুধু গয়নাপরাই নয়, খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচারও চললো।

—বৌমা, আজ মঙ্গলবার, আজ বেগুনপোড়া খেয়ো না। শনি আর মঙ্গলবার পোড়াটোড়াগুলো বাদ দিও।

এই একটু দুর্বলতা মাধবীর। হাজার ভালো জিনিস বাড়িতে রান্না হ'লেও, সময় করে নিজের জন্য একটা বেগুন পুড়িয়ে নেয়। তেল, নুন আর লঙ্কা মেখে উপাদেয় সামগ্রী তৈরি করে। অর্ধেক ভাত তাই দিয়েই শেষ। কাজেই এমন একটা জিনিস বর্জন করা মাধবীর পক্ষে অসামান্য কৃচ্ছ্র সাধনার সামিল।

এ সবেও মাধবীর আপত্তি ছিলো না, যদি প্রার্থনা পূর্ণ হতো, অন্তরের বুভুক্ষু কামনা রূপ পেতো রক্ত-মাংসের স্বতন্ত্র এক সত্তায়।

সকলের অগোচরে মাধবীও হৃদয়ের আবেদন জানাতো। সতীনাথ অফিসে, শাশুড়ী ঘরের দাওয়ায় শুয়েছেন মাদুর পেতে। মাধবী পা টিপে

টিপে উঠে যেতো ঘরের কোণে। আলাদা কোন ঠাকুর ঘর নেই। কোণের দিকে দেয়ালে মা কালী আর জগন্নাথের পট। আধভাঙা একটা লক্ষ্মীর মূর্তি। তারই সামনে মাধবী চোখ বন্ধ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

ভালো খাওয়া, ভালো পরার দিকে সাতজন্মে মাধবীর ঝোঁক নেই। শুধু সে পরিপূর্ণ সংসারের আস্বাদ চায়। স্বামী-সন্তান-জড়ানো নিটোল একটি সংসার।

জানলা দিয়ে আসা রোদের তেজ বাড়ছে। উঠে জানলার কপাটটা বন্ধ করবে, তাতেও মাধবীর আলস্য। চোখে হাত চাপা দিয়ে মাধবী এ পাশ ফিরে শুলো।

নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। সতীনাথ 'শুকতারা' অফিসে কাজ করে। মাসের মধ্যে পনরো দিন রাতে অফিস, বাকি পনরো দিন দিনে। মাধবী বলে শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষ অবশ্য যেদিন স্বামী রাত্রে বাড়ি থাকে।

মাইনে এমন কিছু নয়, কিন্তু হিসেবী সতীনাথ ওরই মধ্যে ঠিক গুছিয়ে সংসার চালায়। প্রাচুর্য যেমন নেই, তেমনি মাসের শেষে অভাব-অনটনও নয়।

কোন দুঃখ নেই মাধবীর। জীবনে কোথাও বিষাদের মান আঁচড় নয়। কিন্তু তবু মাধবী মাঝে মাঝে ধরা পড়ে গেছে।

সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে মাধবীর। বিছানা ঝেড়ে গুটিয়ে রাখছিলো ভোরের দিকে, আচমকা কচি গলার আওয়াজে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

পাশেই গোয়ালার আস্তানা। গোয়ালার বৌ লছমীর সঙ্গে ভাব আছে মাধবীর। দরকারে অদরকারে জানলা দিয়ে কথাবার্তা বলে।

মাস আটেক আগে কোলজোড়া ছেলে হয়েছে লছমীর। হৃষ্টপুষ্ট তেল কুচকুচে চেহারা। কান্নায় পাড়া মাত করতো। এ ঘরে টেকা দায়।

মাঝরাতে সতীনাথ বিছানার ওপর উঠে বসেছে। কানে হাত চাপা দিয়ে বলেছে,—উঃ, এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়! কই গো, শুনছো, তোমার সইয়ের ছেলের জ্বালায় চোখ বন্ধ করার উপায় নেই।

সহজে মাধবীর ঘুম ভাঙেনি। বেশ কয়েকবার ঠেলাঠেলি করার পর ঘুম ভেঙেছে। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে হাই তুললো।

—বাবারে বাবা, মাঝরাত্তিরে ডাকলে কেন? ডাকাত পড়েছে নাকি?

আরে, তা পড়লেও ভালো ছিলো, মুখোমুখি লড়াই করার একটা চেষ্টা করতাম, কিন্তু এ যে ডাকাতের চিৎকারেরও বেশি!

ততক্ষণে কিন্তু কান্নার আওয়াজ অনেক স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। এর মধ্যে লছমী বোধ হয় ভোলাতে পেরেছে ছেলেটাকে।

সেদিন কিন্তু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মাধবী অবাক। এত বড় হ'য়ে গেলো সেদিনের কচি ছেলেটা! সারা গায়ে গোবর আর কাদা, উঠানে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে। মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা, কোমরে ঘুনসি। সর্বাঙ্গে আর কোথাও আভরণ নেই, আবরণও নয়। খিলখিল ক'রে হাসছে, আর এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই প্রথম মাধবীর মনে হলো জানলার শিকগুলো একটা বাধা। মাধবীকে এপাশে ধরে রেখেছে। মনের মধ্যে অদম্য ইচ্ছা। কোন রকমে ছুটে ওদিকে যেতে পারলে কাদামাখা অবস্থায় ছেলেটাকে তুলে নেবে বুকের মধ্যে। প্রাণপণশক্তিতে চটকাবে তাকে। সে রাত্রের মত যতই চেঁচাক, কিছুতে ছেড়ে দেবে না।

—এই, এই, মাধবী মৃদু গলায় ডাকলো দু একবার। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ছেলেটার। হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন। অস্ফুট কণ্ঠে কি সব

বলছে। কতক্ষণ তন্ময় হ'য়ে মাধবী দাঁড়িয়েছিলো, নিজেরই খেয়াল নেই, আচমকা কাঁধে হাত ঠেকতে ফিরে দেখেই অপ্রস্তুত।

পিছনে সতীনাথ।

—কি ব্যাপার, দশ মিনিটের ওপর এসেছি। তোমার জ্ঞানই নেই। এত মন দিয়ে কি দেখছিলে?

কি যে দেখছিলো তা সতীনাথেরও অজানা নয়। জানলার ওপাশ দিয়ে সবই দেখেছে। কিন্তু মুস্কিল মাধবীর। বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী মোচড় দিয়ে উঠেছে, তা ছাড়া জল-টলমল ছুটি চোথ। কি মনে করবে সতীনাথ! হাতেনাতে এমন ভাবে ধরা পড়ে যাবে—

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মাধবী সবে এলো।

—এমনিই দাঁড়িয়েছিলাম। তোমার এত দেরি হলো ফিরতে?

উত্তরটা সতীনাথ এড়িয়ে গেলো। জামা খুলতে খুলতে বলল, বুধনের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

বুধন লছমীর স্বামী। কিন্তু বুধনের সঙ্গে কিসের দরকার! দুধ নেবার কথা তো ওঠেই না। একজোড়া শুধু মোষ আছে বুধনের। মোষের দুধ আবার মানুষে খায় নাকি! মনে করতেই মাধবীর গা ঘুলিয়ে উঠলো।

—বুধনকে কি দরকার? মাধবী ভ্রূ কোঁচকালো।

—ওর ছেলেটাকে পুষ্যি নেবো। কতটাকা পেলে ছেলেটাকে ছাড়বে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

—যাও অসভ্য কোথাকার। মাধবীর সারা মুখে আবীরের ছিটে। দৌড়ে পালিয়ে গেলো এ ঘর থেকে।

ছুটে পালিয়ে গিয়েছে বটে মাধবী, কিন্তু মনে মনে ভেবেছে এমন

সাজানো সংসার একটু অগোছাল করার মত একটা প্রাণী থাকলে বেশ হ'তো। বিছানা ওলোট-পালোট করতো, আনাজের ডালা লণ্ডভণ্ড, তেলের শিশি ভেঙে চুরমার। শাসন করবার ছল করে মাধবী কোলে তুলে নিতো তাকে, চুমোয় চুমোয় অস্থির ক'রে তুলতো।

শাশুড়ী মরিয়া। তাগা-তাবিজ শিকড়ে কিছু না হয় তো বাবা তারকেশ্বর আছেন। ট্রেনে চাপলে আর কতক্ষণের মামলা। ঠিক মত মনের দুঃখ নিবেদন করতে পারলে ঠাকুর ঠিক চাইবেন মুখ তুলে। মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

মাধবীই বাধা দিয়েছে।

—আপনার এই শরীরে আর এসব ধকল করে লাভ নেই।

—এ আর ধকল কি বৌমা! সন্তানের জন্য লোকে আরো কত শক্ত শক্ত কাজ করে। নিরম্বু উপোস সাত দিন সাত রাত, বুক চিরে রক্ত দেয় মানুষ।

মাধবী আর বলেনি কিছু, কিন্তু শাশুড়ীর শরীর খারাপ হ'যে পড়ায় তারকেশ্বরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ননদ মণিমালার বিয়ে হয়েছে বনহুগলীতে। স্বামী ডাক্তার। দু তিন বছর বাদ আসে মাঝে মাঝে। সঙ্গে ছেলের পাল। মেয়ে গোটা দুযেক, ছেলে তিনটি। যে কদিন থাকে বাড়িতে হৈ হৈ কাণ্ড।

বাচ্ছাগুলোর সব ভার মাধবীর ওপর, একেবারে কোলেরটা তো আঁচল ছাড়াই হয় না।

যাবার দিন কান্নাকাটি পড়ে যায়। সকাল থেকে মাধবীর মুখ ভার। সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ঠিক যাবার মুখে ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দেয়।

প্রণাম করার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে মণিমালা মাধবীকে

বাইরে আনে। দু চোখ লাল, ফোলা ফোলা গাল, আগের রাত থেকেই বুঝি কান্নার পালা চলেছে।

সামলে উঠতে মাধবীর দিন পনরো লাগে।

মন ভুলাবার জন্য সতীনাথ অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। মাসের প্রথম দিক হ'লে সিনেমা কিংবা থিয়েটার। তাও মাধবীর ভালো লাগে না। বদ্ধ ঘরে যেন হাঁপ লাগে। বাইরে আসতে পারলে বাঁচে।

খোলা মাঠেও সতীনাথ নিয়ে গেছে। লেকের ধারে কিংবা গঙ্গার ঘাটে। কিন্তু এভাবে বেড়ানো প্রায়ই তো হয়ে ওঠে না। সতীনাথের গোলমেলে ডিউটি, তার ওপর মাকে একলা রেখে হুট হুট করে বরের হাত ধরে বাইরে বাইরে বেড়াতেও মাধবীর লজ্জা করে। তারচেয়ে দাওয়ায় বসে মায়ের সঙ্গে বাগবন্দী কিংবা লুডো খেলাও ঢের ভালো। নিদেনপক্ষে রামায়ণ মহাভারত খুলে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কিংবা শান্তিপর্ব পাঠ।

যেদিন সতীনাথ সারাদিন ঘরে থাকে সেদিন তো কথাই নেই! কাজের ছুতো করে মা ঠিক বেরিয়ে পড়েন। খালি ঘরে সতীনাথের পোয়া বারো। চিৎকার হৈ হল্লা, বেসুরো গলায় গান, সতীনাথের বয়স যেন বছর দশেক কমে যায়।

ঘুমোবার জন্য বিছানায় শুলো বটে মাধবী, কিন্তু রাজ্যের চিন্তা এসে জড়ো হলো। চোখের পাতা বুজলেই মানুষের মুখের আদল, সার সার ঘটনা।

তিনকুলে কেউ নেই মাধবীর। জ্ঞান হ'যে পর্যন্ত মামার বাড়ি মানুষ। অনাদর, অবহেলা অবশ্য কেউ করতেন না, কিন্তু ঠিক আদর আপ্যায়নও নয়। কথায় কথায় শুনতে হতো নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। মা বাপ খেকো। মেয়ের সর্বনেশে পরিণতির ইঙ্গিত। এমন

অপয়া মেয়ে যে বাড়িতে যাবে, তাদের অবধি থাকবে না দুঃখের। মামা মামী কিছু কোনদিন বলেননি মুখ ফুটে, কিন্তু দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা বলেছেন বাড়ি বয়ে এসে, পাড়ার দু একজনও।

সেই থেকে মাধবীর মনেও কেমন একটা ভয় এসে গিয়েছিলো। ওর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ঘুরছে অমঙ্গলের ছায়া। যেখানে গিয়ে উঠবে, সেখানেই আসবে দুঃখের ঝাপটা, বিপদের ঢেউ। বড়ো হ'তে এমন একটা ভয় মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিলো। বিয়ের চেষ্টা হবার সঙ্গে সঙ্গে মাধবী আরো মনমরা। কি জানি নতুন কোন সংসারে গিয়ে উঠতে হবে আবার।

বিয়ে অবশ্য এক কথায় হয়নি। মামার টাকার এমন কিছু জোর ছিলো না, মাধবীও আহা মরি সুন্দরী নয়। তবে ওর মধ্যে মাজা রং আর ডাগর দুটি চোখ নিতান্ত নিন্দার নয়। অনেকেরই চোখে লেগেছিলো, তবে দরে বনেনি। ছাপোষা মামার খরচ করার বহর শুনে সবাই পিছিয়ে গিয়েছিলো।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার। কোন কোন সপ্তাহে আবার শনি রবি পর পর দুদিন। মাধবীরও অনেকটা গা-সওয়া। বিকেল হলে সেজে-গুজে ঘাড় হেঁট করে তাদের সামনে বসা। মন-রাখা উত্তর দেওয়া। কাঁপা-হাতে কাগজের ওপর নিজের নামটা লেখা, ইংরেজি আর বাংলায়। তারপর সপ্তাহান্তে একটা পোস্টকার্ড কিংবা কারুর মারফত খবর—মেয়ে অপছন্দ হয়নি, তবে দেনা-পাওনার কথাটা হওয়া দরকার। দিন কতক ধরে ফিসফাস মামা আর মামীর। কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসেবপত্র। চিঠি লেখালেখি, তারপর এক সময়ে সব থিতিয়ে আসতো। অত চড়া দরে ছেলে কেনার সাধ্য নেই মামার।

প্রথম দিকে দু একটা ভালো পাত্র এলেও, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

পাত্রের ধারাও বদলাতে লাগলো। কারখানার ফিটার, অফিসের দপ্তরী, একটা বাসের কণ্ডাক্টরও এসে হাজির। মামাও মরিয়া। ছেলে হলেই হলো, দু বেলা দু মুঠো খাওয়াতে পারে। ব্যস!

ঠিক এই সময় মাধবী গলায় আঁচল জড়িয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকতো। টিপ টিপ ক'রে প্রণাম, আর চোখ বন্ধ করে কি চাইতো সে কথা ভাবলে আজও মাধবীর দু গালে রঙের সঞ্চার হয়, দু চোখে লজ্জার ছায়া।

মাস দুয়েক সম্বন্ধ আসা একেবারে বন্ধ। মামা কপালে হাত চাপড়ালেন, মামী নির্বাক। এ মেয়ে আর পার হবে না, ঘরে বাইরে এমন একটা কথা উঠলো।

ওরই মধ্যে একদিন খবর এলো। পাড়ার এক ভদ্রলোকের মারফত। ছেলে আর তার বন্ধু দেখতে আস্‌বে রবিবারের বিকেলে।

অন্যবারের মতনই সেজে-গুজে ঘাড় হেঁট ক'রে মাধবী বসলো। চুপচাপ বসেই আছে। ওদিক থেকে কোন প্রশ্ন নয়, কোন কথাই নয়। আস্তে আস্তে মাধবী ঘাড় তুললো। চোখ তুলেই অবাক।

সামনের ভদ্রলোক দুটি ঘাড় নিচু করে বসে রয়েছেন। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন মেঝের দিকে। চট করে চোখ তুলবেন এমন আশা কম। কে কাকে দেখতে এসেছে বোঝা মুশকিল।

মামাই কথা বললেন দু একটা। মাধবীর গুণপনা কীর্তন, এমন মেয়ে হাজার খুঁজলেও ভূভারতে দুটি মিলবে না তার ব্যাখ্যা। সেই দিনই সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেলো। এমন কি বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত।

সে কথা নিয়ে মাধবী বলতে ছাড়ে না সতীনাথকে। কিগো, আজ তো মুখে খুব খই ফুটছে, সেদিন ঘাড় নিচু ক'রে কনে বৌটির মতন বসেছিলে কেন?

সতীনাথ মুচকি হাসে। বলে, জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। ও তো ঠিক হ'য়েই আছে। আমি আর কথা বাড়িয়ে কেন বাধা হই।

চোখ দুটো জোর করে মাধবী বন্ধ করে ফেললো। যতো উটকো কথা মনে আসছে। আয়েশ করে একটু শোবে তার উপায় নেই।

হাত দিয়ে পাশ বালিশটা আঁকড়ে মাধবী চোখ বুজলো, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেলো কথাটা।

কাল বিকেলেই চলে গেছে রাধার মা। বোনপোর বিয়ে। আজ সমস্ত দিন আসতে পারবে না। তার মানে ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া, উনান ধরানো সব মাধবীকে করতে হবে। এসব কাজে খুব অসুবিধা নয়, কিন্তু বিশ্রী লাগে ওই উঠান ঝাঁট দিতে নিচু হ'য়ে, মাজায় ব্যথা ধরে যায়। যত রাজ্যের গাছ পাতা, কাকে এনে ফেলা মাছের কাঁটা, হাড়ের টুকরো বোঝাই থাকে। ঝাঁট দেওয়া শেষ করেই স্নান সেরে ফেলে মাধবী। না হলে গা ঘিন ঘিন করে।

হাই তুলে মাধবী বিছানার ওপর উঠে বসলো। এই বেলা শুরু না করলে কাজ শেষ করতে পারবে না।

দু একবার আড়ামোড়া ভেঙ্গে মাধবী নেমে দাঁড়ালো।

কল ঘর থেকে মুখ হাত ধুয়ে মাধবী আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিলো। তারপর কাজের পালা আরম্ভ।

দুটো ঘর পরিষ্কার ক'রে এক ফাঁকে মাধবী উনান ধরিয়ে এলো। আস্তে রান্না ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে উঠানে নামলো। দরজা না বন্ধ করলে ধোঁয়ায় ভরে যাবে সারা ঘর। দম বন্ধ হয়ে আসবে।

অর্ধেক উঠান ঝাঁট দেওয়া শেষ ক'রে মাধবী একটু জিরিয়ে নিলো। ঝাঁটা ফেলে দিয়ে বসলো দাওয়ার পৈঠায়। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালে

জমে ওঠা ঘামের বিন্দু মুছে নিলো। আঁচল ঘুরিয়ে হাওয়া খেলো কিছুক্ষণ ধ'রে, তারপর ঝাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো।

কাঁটা, হাড়, রাজ্যের স্তূপাকার জঞ্জাল। এদিক ওদিক চেয়ে মাধবী দরজার পাশে রাখা একটা পুরানো বাক্স তুলে নিলো। রাধার মা এরই মধ্যে জঞ্জাল ভরে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে।

বাক্সে জঞ্জাল ভর্তি করে মাধবী দরজার পাশে দাঁড়ালো। এইটেই সবচেয়ে শক্ত কাজ। বাক্স তুলে নিয়ে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসা। ডাস্টবিন এমন কিছু দূরে নয়, প্রায় পাঁচিলের গায়েই। কয়েক পা। কিন্তু ভারী লজ্জা করে মাধবীর। পথচলতি লোক এত ভোরে অবশ্য খুব বেশি নেই, কিন্তু দু একজন যা আছে, তাদের জন্যই যত লজ্জা। জঞ্জাল হাতে করে রাস্তা পার হবার সময় যদি চোখাচোখি হ'যে যায়, মুখ তুলে কেউ দেখে?

মাধবী একবার ভাবলো বাক্সটা দরজার কোণে রেখে দেবে, পরের দিন রাধার মা এসেই না হয় ফেলে দেবে। কিন্তু গঙ্গাস্নান সেরে শাশুড়ী দেখতে পেলেই চেঁচাতে আরম্ভ করবেন। এমনিতে ভারি পরিষ্কার মানুষ। কোন খানে ময়লা, নোংরা, দেখতে পারেন না। হয় তো নিজে হাতেই বাক্সটা ফেলে দিয়ে আসবেন ডাস্টবিনে, তারপর কলঘরে ঢুকে বালতি বালতি জল ঢালবেন মাথায়। তার চেয়ে এদিক ওদিক দেখে ফেলে দিয়ে আসাই ভালো।

কপাল অবধি ঘোমটা ঢাকা দিয়ে মাধবী নিচু হ'যে বাক্সটা তুলে নিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গলিতে জুতোর মশমশ শব্দ। দরজার কবাট ভেজিয়ে মাধবী দাঁড়ালো চুপচাপ। ভারি বুট পায়ে কে একজন পার হযে গেলো। বাঁহাতি একটু এগোলেই ডাস্টবিন। জুতোর বাক্সের জঞ্জাল উপুড় ক'রে ফেলে দিয়ে ফিরতে গিয়েই মাধবী অবাক।

একি কাণ্ড! ঠিক ডাস্টবিনের গায়েই ন্যাকড়ার পুঁটলি। একটা পায়ের কিছুটা বেরিয়ে রয়েছে। চুল ভরা মাথার খানিকটা। হাত ফসকে জুতোর বাক্সটা পায়ের ওপর পড়তেই ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। পুঁটলি থেকে মুষ্টিবদ্ধ একটা হাত দেখা গেলো। কান্নার শব্দ আরো জোর। দ্বিধা, সংশয় সব ঘুচে গেলো মাধবীর। বুকের মাঝ-খানে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা। উত্তপ্ত হয়ে উঠলো সারা মুখ। এত দিনে বুঝি কথা শুনেছেন ঠাকুর, মুখ তুলে চেয়েছেন।

এদিক ওদিক চেয়ে নিচু হ'য়ে মাধবী কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে নিলো। নিজের বুকের আতপ্ত সান্নিধ্যে। নরম তুলতুলে। ক্ষিপ্রহাতে মাধবী ন্যাকড়াগুলো সরিয়ে দিলো গা থেকে। কাল চোখ, লাল টুকটুকে ঠোঁট। সদ্যোজাত পুত্রসন্তান। অবাঞ্ছিত।

দুহাতে জড়িয়ে মাধবী চৌকাঠ পার হয়ে উঠানে এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য, অত চিৎকার, অত কান্না সব নিমেষে চুপ। মাঝে মাঝে শুধু গোঙানির শব্দ। অভিমান। বুকের ধনকে পথের ধুলোয় ফেলে রাখা হয়েছে, অভিমান বুঝি সেইজন্য।

মাধবী আরো নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলো রক্তের ডেলাকে।

দুতিন মিনিট। মাধবী কর্তব্য ঠিক ক'রে নিলো। তাক খুঁজে মধুর শিশি পাড়লো। মিছরি ভেজালো জলে। ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে অল্প অল্প ক'রে শিশুর মুখে দিলো। প্রথম কয়েক ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো, তারপর একটু একটু করে ঠোঁট নড়তে শুরু হলো। মুখের মধ্যে গেল বেশ কয়েকটা ফোঁটা। খাওয়ানো বন্ধ করতেই আবার চিৎকার। মুষ্টিবদ্ধ দুটো হাত, লাল হয়ে উঠলো সারা মুখ।

—বাবা, বাবা, আচ্ছা ছেলে তো! এতক্ষণ রাস্তায় দিব্যি মুখ বুজে পড়েছিলো, আর বাড়িতে কোলে চড়ে যত কান্না।

আর একটু মিছরির জল খাওয়ানোর পর কান্না থামলো। চোখ বন্ধ করে ঘুমোতে আরম্ভ করলো। বিছানা থেকে বালিশের একটা ঢাকা টেনে নিয়ে মাধবী বাচ্ছাটার গায়ে চাপালো।

এতক্ষণ পরে মাধবী নিরীক্ষণ করে দেখবার অবসর পেলো। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। টুকটুকে রং। নরম তুলতুলে গাল। সন্তর্পণে মাধবী বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

মাধবীর শাশুড়ী প্রথমে ফিরলেন। উঠানে দাঁড়িয়ে কমণ্ডলু থেকে জল ঢাললেন দুপায়ে, তারপর বললেন, বৌমা, অ বৌমা!

সতীনাথের বিছানায় বাচ্ছাটাকে শুইয়ে দিয়ে মাধবী বাইরে এসে দাঁড়ালো, কি মা!

—কাল ভোরে উঠে আমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যাবে। এক মৌনীবাবা এসেছেন। যে যাচ্ছে তাকে একটা করে হরতকী দিচ্ছেন, তাতেই নাকি বাসনা পূর্ণ হচ্ছে।

—আর যাবার দরকার হবে না মা! খুব আস্তে মাধবী বলল। লজ্জাজড়ানো গলায়।

শাশুড়ী চমকে উঠলেন। তার মানে? এতদিন পরে বুঝি বাবা বিশ্বনাথ মুখ তুলে চেয়েছেন। কিছুই তো জানাযনি মাধবী। ক মাস? কবে থেকে টের পেয়েছো? ঠিক তো, না বুড়ী শাশুড়ীকে ভোলাবার মতলব।

—সে সব কিছু নয় মা। মাধবী দাওয়া থেকে পিছু হেটে হেঁটে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল, আপনি একটু ঘরের মধ্যে আসুন।

সাত সকালে এ আবার কি হেঁয়ালি সুরু করেছে মাধবী! একথা জানবার জন্য ঘরের মধ্যে যাবার কি দরকার!

কিন্তু অদম্য কৌতূহল। কমণ্ডলু দাওয়ায় রেখে শাশুড়ী চৌকাঠ

বরাবর দাঁড়ালেন। বাসি বিছানা, হয়তো ঝাঁটসাট হয়নি, স্নান সেরে ঢোকাটা ঠিক হবে না।

—কি বলো বৌমা ?

বৌমাকে আর বলতে হলো না। ঠিক এই সময়ে ঘুম ভেঙে বাচ্ছাটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। হাত পা ছুঁড়ে।

শাশুড়ী সব ভুলে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা।

—ওমা, এ কোত্থেকে এলো গো! এ যে বড্ড বাচ্ছা।

হঠাৎ কি মনে হ'তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সদ্যোজাত শিশু। একে কোথা থেকে মাধবী আহরণ করলো!

সরে একেবারে চৌকাঠের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালেন।—কি ব্যাপার বলো তো বৌমা—এ কাদের বাচ্ছা ?

—জানি না মা, মাধবী আঁচলের খুঁট জড়ালো আঙুলে, বলল, কুড়িয়ে পেয়েছি।

কুঁচকে এলো জোড়া ভ্রূ। কয়েকটা আঁচড় পড়ল গালের দু পাশে। বলিরেখা গভীরতর।

—কুড়িয়ে পেয়েছো? শাশুড়ীর গলার স্বরও যেন পালটে গেল।

—হ্যাঁ মা, সকালে জঞ্জাল ফেলতে গিয়ে। ডাস্টবিনের ধারে ন্যাকড়া-জড়ানো অবস্থায় পড়েছিলো।

—বৌমা! শাশুড়ীর এমন কঠিন কণ্ঠ কোনদিন শোনেনি মাধবী। চৌকাঠ পেরিয়ে, দাওয়া পেরিয়ে শাশুড়ী একেবারে উঠানে এসে দাঁড়ালেন। কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মাথায় গায়ে ছিটোলেন। বিড় বিড় করে যেন মন্ত্রও উচ্চারণ করলেন।

—তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান কিছু নেই বৌমা! রাস্তার পাপ তুমি কুড়িয়ে ঘরে এনে ঢোকালে। ছি, ছি, ছি!

রাস্তার পাপ! মুহূর্তে মাধবীর মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন নিঃশেষে শুষে নিলো। কথাটা তার যে একেবারেই মনে আসে নি এমন নয়। কিন্তু ভেবেছে সদ্যোজাত শিশু, এ তো পাপ পুণ্যের বাইরে। পৃথিবীর মালিন্য কেন একে স্পর্শ করবে।

পাশাপাশি আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল। বছর দুই আগে। সতীনাথের বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। ভদ্রলোকের মা নিজে এসে বিশেষ ক'রে বলে গিয়েছিলেন মাধবীর শাশুড়ীকে। কোন ওজর আপত্তি চলবে না। পায়ের ধুলো দিতেই হবে তাঁকে। এমন কিছু দূরে নয়। চন্দননগর।

গাড়ির দেরি ছিলো। প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চের ওপর বসতে গিয়েই মাধবীর শাশুড়ী চমকে উঠলেন।

বেঞ্চের নিচে মেঝেয় শোযানো হৃষ্টপুষ্ট এক শিশু। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই।

—ও বৌমা, সেদিন মাধবীর শাশুড়ী ফিসফিসিযে বলেছিলেন, ছেলেটাকে নিযে পালাই চলো। ভগবান বোধ হয আমাদের জন্যই এটাকে রেখে গিয়েছেন।

অবশ্য ছেলেটাকে তুলে নেবাব অবকাশ মেলে নি। ছেলেটার মা লাইন পাব হযে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলো। স্টেশনের ভিখারিনী। ছেলেকে রেখে বোধ হয় জল খেতে গিযেছিলো।

কথাটা রহস্যচ্ছলেই হয তো বলেছিলেন, কিন্তু সবটুকু যে রহস্য এমন কিছু মনে হযনি। 'মনে হযেছিলো, আচমকা যদি বেওযাবিশ ছেলে একটা কুড়িযে পাওযা যায, তো বেশ হয। ভগবানের দান বলেই বুকে তুলে নেওযা যাবে।

তেমন একটা সুযোগই ভগবান আজ মিলিযে দিয়েছেন। তবে?

—ভালো চাও তো যেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছো ও জিনিস সেখানে রেখে দিয়ে এসো।

অনুরোধ নয়, আদেশ।

মাধবীর শাশুড়ী উঠানে উবু হয়ে বসলেন। ভাবটা যেন, এ পাপ বাড়ি থেকে বিদায় না হ'লে তিনি বাড়িতে ঢুকবেন না।

কান্নার শব্দ বাড়তে মাধবী ছুটে ঘরের মধ্যে গেলো। কেঁদে কেঁদে নীল হয়েছে ছেলেটা। ক্ষিদে হয়তো পেয়েছে। নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়ছে। আর একটু মিছরির জল খাওয়াতে পারলে হ'তো কিংবা সামান্য মধুর ফোঁটা।

মিছরির শিশি পাড়তে গিয়েই মাধবী বাধা পেলো। উঠানে ভারি জুতোর শব্দ। এ শব্দ মাধবীর অচেনা নয়।

সতীনাথ উঠানে এসে নামতেই মা ছেলের কাছে সব বললেন। একটি একটি করে। ডাস্টবিনের জঞ্জাল বৌমা ঘরে এনে তুলেছে। বাইরের কেলেঙ্কারি অন্দরে। হাজার বলা সত্ত্বেও আচ্ছা গো, কিছুতেই আপদ বাইরে ফেলে আসবে না।

মাধবী ফিরে দাঁড়ালো। আর ভয় নেই। সতীনাথ এসে গেছে। এমন একটা বিপদে এত বড় সহায় আর কেউ নেই। কতদিন পোষ্য নেবার কথা বলে ঠাট্টা করেছে। সত্যিকারের সন্তান ঘরে এসে পড়েছে, ফুলের মত সুন্দর শিশু। পথের আবর্জনায় একে আবার ফেলে দিয়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না।

কতবার সতীনাথ বলেছে, কর্তব্য থেকে কখনও একচুল নড়বে না। হাজার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। যীশুখ্রীষ্টের কাহিনীও বলেছে। কুমারী মেরীর গর্ভজাত সন্তান। সূতপুত্র কর্ণের উপাখ্যান। পাপের ফল হয়তো এই শিশু, কিন্তু সে তো নিষ্পাপ।

মাধবীর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেলো সতীনাথের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে।

—কি ছেলেমানুষী করছো! কি জাতের ছেলে তার ঠিক নেই। মানুষের পাপের বোঝা ঘরে এনে তুলছো। যাও, এইবেলা কেউ কোথাও নেই, যেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছো, সেখানে রেখে দিয়ে এসো।

মাধবী মুখ তুললো। শুধু সতীনাথের মুখটাই নয়, আশ-পাশের সব কিছু ঝাপসা। অপরিচিত মানুষ, আর অপরিচিত পরিবেশ।

সতীনাথ আবো কয়েক পা এগিয়ে এলো। ঘরের ভিতর।

—দেখো হাঙ্গামা একটা হবে। পুলিশে পাড়া ছেয়ে যাবে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে খোঁজ-খবর নেবে। নাও নাও, তোলো, যেমন ছিলো, তেমনি ভাবে রেখে দিয়ে এসো। ও বিষের মূল আবার মানুষ ঘরে এনে তোলে, সাতজন্ম ছেলেপুলে না হয় সেও ভালো।

আর একটি কথাও নয়। মাধবী শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে বাইরে চলে এলো। এরা সব মিথ্যাবাদী। সংসারে সন্তান কেউ চায়নি এরা, স্বার্থপরের মতন আত্মজের সন্ধান করেছিলো। এ ভালবাসা শুধু নিজের সৃষ্টিকে ঘিরে।

দাওয়া পার হ'য়ে, উঠান পার হ'য়ে বাইরের দরজার কাছে এসে মাধবী দাঁড়ালো। পিছনে সতীনাথ। এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে মাধবী দেখলো। জনমানব নেই। কে একজন এগিয়ে আসছিলো, কিন্তু গলির মাঝ বরাবর এসে কি ভেবে আবার ফিরে গেলো।

পায়ে পায়ে মাধবী এগিয়ে এলো। ডাস্টবিনের কাছে। কিন্তু বুক থেকে নামাতে গিয়েই এক বিপদ। কঠিন মুঠিতে নবজাতক মাধবীর শাড়ির আঁচল আঁকড়ে ধরেছে। একবার সে ঘরের আস্বাদ পেয়েছে, আর সে পথের ধুলোয় নামতে রাজী নয়। ককিয়ে ককিয়ে

কান্না। ভাষাহীন। কিন্তু মাধবীর মনে হ'ল স্পষ্ট বলছে, মা, মা, মা।

বুকের শিরাগুলো পর্যন্ত ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলো। অসহ্য যন্ত্রণা। মা হ'তে চলেছে যেন মাধবী। সমস্ত শরীর মথিত ক'রে অব্যক্ত বেদনা। পর নয়, এতো বুকের জিনিস, নিজেরই ন'ড়ি-ছেঁড়া ধন, কি ক'রে আবর্জনায় নামাবে একে! নির্মম হাতে শক্ত মুঠি থেকে নিজের আঁচল ছাড়িয়ে নেবে!

পাপ

তিনতলায় বরযাত্রীদের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। বিয়ের লগ্ন রাত তিনটে বত্রিশে, কাজেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা আগে ক'রে ফেলাই সমীচীন। সিঁড়ির মুখে ভাইপোর গলার আওয়াজ, কাকাবাবু, একটু শুনুন এদিকে।

সিঁড়ির কাছ বরাবর এগিয়ে এলাম। কি ব্যাপার! পান সিগারেটের সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে আমি এসেছি। একটি ঝাঁকড়া-চুল প্যাকাটি-লাঞ্ছিত শরীর বরযাত্রী কোলের ওপর হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গজল শুরু করতে জোরপায়ে তিনতলায এসে উঠেছে। আবার কি ব্যাপার!

ব্যাপার ঘোরালো। ভাইপোর মুখে বিবরণ শুনে রেলিং ধরে টাল সামলালাম। বর উঠে যাচ্ছে আসন ছেড়ে। এমন ঘরে সে বিয়ে করবে না। সর্বনাশ! আসন ত্যাগ করার হেতু শুনে ঘাম জমে উঠল কপালে, চোখের সামনে অসংখ্য হলদে ফুলের স্তবক।

কনের নাকি ভালবাসা ছিল বিয়ের আগে। পাড়ার কোন এক ছোকরার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালিখিও চলত। এমন কালসাপ ঘরে ঢোকাতে পাত্র নারাজ।

—এসব বাজে কথা কে বললে তাকে মনু? হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বললাম। দুটো পা-ই ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। তালু শুকিয়ে কাঠ।

—বলবার লোক যে কে তাতো ভালই জানেন কাকাবাবু। মনুর গলায় ঝাঁজের মিশেল। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কড়া কড়া কথার বিনিময় হয়েছে নিশ্চয়। সবকিছু নিঃশেষে হজম করেনি। কিছুটা হুল ফেরতও দিয়েছে।

—নরেশ ? আমতা আমতা করলাম।

—তা ছাড়া আবার কে ? সন্ধ্যা থেকে দেখছি বরের কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। এখন অবশ্য আর দেখতে পাচ্ছি না। ছোবল মেরেই সটকেছেন।

নরেশ, মানে আমার জ্ঞাতিভাই। আমরা গ্রামে ফিরে আসাতে তাদেরই ক্ষতি হ'য়েছে সবচেয়ে বেশি। মাঠের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফলপাকুড়ের ভাগীদার জুটতে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। মনের রাগ মনে চেপেছিল এতদিন, কিন্তু পুকুরপাড়ের সীমানা নিয়ে বাষ্প বহ্নির রূপ নিল। দেওয়ানী আর ফৌজদারী—দুখাতে প্রবাহিত হ'ল বিদ্বেষের লাভা স্রোত। তবুও মেয়ের বিয়েতে সবকিছু ভুলে আমি নিজে নিমন্ত্রণ করে এসেছি গলবস্ত্র হ'য়ে। বাঁকা বাঁকা কথা, টিটকারি কিছু গায়ে মাখি নি। এই আমার প্রথম কাজ, এমন একটা ব্যাপারে জ্ঞাতিভাই দূরে সরে থাকবে, ভাবতেও ভাল লাগে নি। কিন্তু একবারও ভাবি নি খাল কেটে কুমির এনেছি নিজের এলাকায়। এখন ভয় পেলে চলবে কেন ?

মনুর সঙ্গে যখন নিচে পৌছলাম তখন জটলা শুরু হ'য়েছে। বর একেবারে উঠানের মাঝখানে। তাকে ঘিরে সাঙ্গোপাঙ্গের দল। অন্তঃপুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে ফোঁপানির শব্দ কানে এল। কথাটা সেখানেও পৌছেছে। আমি যেতেই পাত্রের মামা এসে দাঁড়ালেন। জরাজীর্ণ চেহারা, হাতে গলায় মাদুলির ভারে ন্যুব্জদেহ।

এতক্ষণ ঘরের কোণে পালাজ্বরে কোঁ কোঁ করছিলেন, বড়লোক ভাগনের চেঁচামেচিতে খাড়া হ'য়ে উঠেছেন। কথার তুবড়ি, বন বন ক'রে পাক খাচ্ছে দু চোখের তারা।

—ছি ছি, আপনার এই কাজ মুখুজ্যেমশাই ?

সবটা মামাকে আর বলতে হ'ল না, ভিড় ঠেলে ভাগনেই এগিয়ে এল, শুধু চোখ নয়, ঘুষিও পাকিয়ে।

—কি মশাই, দিব্যি মেকি দুআনি চালিয়ে দিচ্ছিলেন তো ? ভাগ্যিস খবরটা কানে এল, নইলে হ'য়েছিল আর কি !

কনের বাপেদের জন্য ভগবান আছেন কিনা জানি না, থাকলেও অসহায় আর্তনাদেও বোধহয় তাঁর ঘুম ভাঙে না। বহুকষ্টে নিজেকে সামলালাম দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে। খুব আস্তে বললাম, কি ব্যাপারটা দয়া ক'রে ভেঙে বলবেন আমাকে ?

—আ হা হা, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না ! ন্যাকা সাজারও সীমা আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো ছুঁড়ে দিল। তার তপ্ত স্পর্শ শুধু ত্বকেই নয়, জ্বালা ধরাল মর্মস্থলে।

পাত্র হাত দিয়ে গোলমাল থামিয়ে দিল, গম্ভীর গলায় বলল, ভদ্রলোককে শুনতেই দাও না ব্যাপারটা। কি উত্তর দেন শুনি।

সংক্ষেপেই বলল। আমার মেয়ে বহুদিন ধরে ডুবে ডুবে জল গিলছিলেন। শিবের বাবা কেন, নিজের বাবাও বোধহয় জানতে পারেন নি, পারলেও বেগতিক দেখে স্রেফ চেপে যাচ্ছেন ব্যাপারটা।

দম নিলাম। খুব সংযত গলায় বললাম, কথাটা শুনেছেন বোধহয় পাড়ার নরেশ মুখুজ্যের কাছে ?

—অত নাম ধাম গোত্র কুলুজি জানি না মশাই। আমার স্পষ্ট কথা, মেয়ে কালো হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, সব সহ্য

করব, কিন্তু চরিত্রে এক ফোঁটা দোষ থাকলে, অন্ততঃ চিন্তাপুরের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে বৌ হ'য়ে ঢুকতে পারবে না।

—খুবই ঠিক কথা, হক কথা, আমি আবার দম নিলাম, ডানহাতে পৈতে জড়িয়ে বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা জপ না ক'রে জলস্পর্শ করি না। যদি আমি পৈতে ছুঁয়ে বলি, ব্যাপারটা সর্বৈব মিথ্যা, কুলোকের রটনা, জ্ঞাতিশত্রুর কারসাজি, তা হ'লে কি বিশ্বাস হবে? তা ছাড়া, চলুন আপনারা আমার সঙ্গে নরেশ মুখুজ্যের বাড়ি, ডাকুন তাকে আমার সামনে। নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলুক কথাটা সত্যি। আমি একটি কথাও বলব না। গুণে গুণে সাত জুতো আপনারা মারুন আমাকে, যে শাস্তি ইচ্ছা দিন, মাথা পেতে নেব।

পাড়ার বুড়ো লোক কয়েকজন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার কথা শেষ হ'তেই বললেন, যা শুনেছ, একেবারে মিথ্যে কথা বাবাজী। নরেশটা চিরকাল এমনি ধরনের। কেবল পরের সর্বনাশ করার চেষ্টা। জমি নিয়ে মামলা বেধেছে ডাক্তারের সঙ্গে, তাই বিয়ে পণ্ড করার জন্য এ সব রটাচ্ছে। আমাদেরও বাড়ি গিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণে আসতে বারণ করেছিল। ডাক্তারের নাকি জাত নেই! সায়েবসুবোর সঙ্গে যা তা খেয়েছে শহরে।

পাত্রপক্ষের চিৎকার কিছুটা কমলো বটে, কিন্তু গুঞ্জরন থামল না। পাত্র নিজেই প্রস্তাব করল, বেশ, সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে চলুন। মুখোমুখি বোঝাপড়া হ'য়ে যাক। সবকিছু নিজের কানে না শুনে, পাপ আমি ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না।

—এই তো মরদের কথা। কে একজন জোর গলায় সায় দিল।

অগত্যা দল বেঁধে যাওয়া হ'ল নরেশের বাড়ি। দূর এমন কিছু নয়। বাগানটা পার হ'য়েই দুতলা জরাজীর্ণ বাড়ি। ব্যাপারটা নরেশ বোধহয়

আঁচ করেছিল। আমরা বাড়ির কাছে বরাবর যেতেই হ্যারিকেনের স্তিমিত দীপ্তিটুকুও নিভে গেল। কাছে গিয়ে নাম ধ'রে ডাকতেই দু একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মিনিট দশেক ধরে চেঁচামেচি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এবারে পাত্রের মামা কথা পাড়লেন, ঠিক আছে মশাই, চলুন ফিরে যাওয়া যাক। যত সব বদমাইস লোকের কাণ্ড! দিলে মেজাজটা খারাপ ক'রে।

পাত্র তবু নাছোড়বান্দা। বৃদ্ধ ঘোষাল মশাইয়ের দিকে ফিরে বলল, আপনি প্রাচীন লোক, আপনি দিব্যি ক'রে বলুন, মেয়ে নিষ্পাপ ?

ঘোষাল মশাই পাত্রের একটা হাত জড়িয়ে ধরলেন। আস্তে বললেন, ডাক্তারবাবুর মেয়েকে আমরা অনেকদিন থেকে জানি। রূপ গুণ চাল চলন সবই মায়ের আমার নিন্দার বাইরে। আর তা ছাড়া, এ অজ পাড়াগাঁয়ে ওসব নভেলী ব্যাপারের কোন চল নেই বাবাজী। তুমি নির্ভয়ে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যেতে পার।

পাত্র এবার ফিরল নিজের মামার দিকে, কি বল মামা, তুমি গুরুজন উপস্থিত রয়েছ, তুমি যা বলবে তাই হবে।

মামার অবস্থা কাহিল হ'য়েই এসেছিল। দুটো চোখ লাল, কাঁপুনিও বেশ জোর। জ্বরটা খুবই তেড়ে এসেছে। এই অবস্থায় বর উঠিয়ে নৌকায় ফিরে যেতে হ'লেই মুশকিল। দেশ অবধি গিয়ে হয় তো আর পৌঁছোতেই হবে না। তার চেয়ে মিটমাট একটা হ'য়ে যাওয়াই ভাল।

কাজেই তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এঁরা বলছেন যখন, তখন ঠিকই আছে। শুভ কাজটা শেষ ক'রেই নাও।

পাত্র তার পরেও হাতমুখ নেড়ে চারিত্রিক নিষ্ঠার মহত্ত্ব সম্বন্ধে দু-এক কথা বলল, অবশ্য বন্ধুদের দিকে ফিরে।

কোণের দিকে দাঁড়িয়েছিলাম চুপচাপ। আমার অবস্থা একেবারে নিন্দার নয়। সরকারী ডাক্তার হিসাবে যশ আর অর্থ দুই-ই আহরণ করেছিলাম। মেয়ের বিয়েতে খরচপত্র নেহাত কম করছি না। একবার মনে হ'ল, স্পষ্ট গলায় বলি, দরকার নেই এমন ঘরে মেয়ে দিয়ে। আমার মেয়ে সাতজন্ম না হয় কুমারীই থাকবে, তবু এমন মানুষের গলায় মালা দেবে না। কিন্তু মনকে বোঝালাম। পাত্রের আর দোষ কি! ঘরের শত্রু বিভীষণই যত নষ্টের মূল। তাছাড়া, এমন পাত্র হাতছাড়া করলে, পরে পস্তাতে হবে। একটু পড়তির মুখে, তা হোক, নামী জমিদার বংশ। এখনও নেই নেই করেও, আয় মন্দ নয়। এ ছাড়াও ছেলেটি শহরে নতুন কারবার ফেঁদেছে। চামড়ার ব্যবসা। একবার দাঁড়িয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। গয়নায় মেয়ের গায়ের চামড়া দেখা যাবে না। দেখতে শুনতেও ছেলেটি ভাল। লেখাপড়া তেমন জানে না ব'লে বাড়িতে একটু ক্ষীণ আপত্তির সুর উঠেছিল, কিন্তু টেকে নি।

ভালোয় ভালোয় বিয়েটা শেষ হ'য়ে গেল। বরকনে নৌকায় উঠতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

বছর দুই কেটে গেছে। দু একবার মেয়েকে আনতে লোক পাঠানো হ'য়েছিল, মেয়েকে পাঠায় নি। নানা ওজর আপত্তি তুলে এড়িয়ে গেছে। গৃহিণীর শরীরের অবস্থা খারাপ। বাত ছিলই, তাতে বিশেষ কাত করতে পারে নি, কিন্তু হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী মাস ছয়েক। ইদানীং বাড়াবাড়ি চলেছে। সকাল বিকাল ইনজেকশন দিচ্ছি। দামী দামী দু একটা টনিক, কিন্তু উন্নতির লক্ষণ চুলোয় যাক, দিন দিন অবনতিই হচ্ছে। মেয়েকে দেখার খুব ইচ্ছা। সারা দিনরাত মেয়ের নাম করছেন। আমার এ শরীরে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবার ধকল সইবে না। নৌকা, পালকি, নয়ত গরুর গাড়ি। সব মিলিয়ে পাক্কা

মাইল কুড়ি। এ বয়সে সাহস হ'ল না। মোলায়েম একটা চিঠি লিখে বড় ছেলেকেই পাঠালাম। অভিভাবক বলতে সেই পালা-জ্বরাক্রান্ত মামা, তাই চিঠিটা সোজাসুজি জামাইকেই লিখলাম।

দিন তিনেক। ভোরের দিকে গরুর গাড়ি এসে দাঁড়া'ল। দাওয়ায় বসে দাঁতন করছিলাম, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘোমটা মাথায় মেয়ে এসে দাঁড়াল। বেশ যেন রোগা, গায়ের রঙও তামাটে। মাঝে মাঝে চিঠি অবশ্য লিখেছে। তাতে অসুখ বিসুখের কোন খবর পাইনি, তবে বিষাদের একটা প্রচ্ছন্ন সুর ছিল। কিসের যেন একটা অভাব, অর্থ, আভিজাত্য সব পেয়েও পরিপূর্ণ শান্তি যেন পায় নি। দু একবার ছেলেরা গিয়েছিল বোনের বাড়ি। তারা ফিরতে গৃহিণী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।—মিনতি ভাল আছে তো? জামাই? আদরযত্ন করলে তোদের?

ছেলেদের কথায় এমন কিছু মনে হয় নি যাতে ধারণা হ'তে পারে মিনতি কষ্টে আছে। দেহের কিংবা মনের। সেইজন্যই গৃহিণী বললেন, নাই এল মিনতি। সুখে থাক, শান্তিতে থাক। আর আমার কিছু দরকার নেই।

মিনতি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ঘোমটা না সরিয়ে।—থাক্ মা থাক, চিবুক ধরে আদর করতে যেতেই ঘোমটা একটু সরে গেল। খুব অল্প, কিন্তু তাতেই কাজ হ'ল। ডাক্তারী চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

হাত দিয়ে ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব কবে থেকে হয়েছে মিনতি।

মিনতি প্রথমে কোন উত্তর দিল না। ঘোমটাও সরাল না। দুটো চোখ জলে ভরে এল। কেঁপে কেঁপে উঠল দুটো ঠোঁট। আবার জিজ্ঞাসা করাতে আস্তে আস্তে বলল, প্রায় বছর খানেক।

চোখের সামনে থেকে অনেকগুলো দিন সরে গেল। ভেসে উঠল আর এক আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। কুৎসা আর অপবাদে পঙ্কিল রাত্রির আকাশ। চিন্তাপুরের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে পাপ না ঢোকে তার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস।

আর একবার ভাল করে দেখলাম মিনতির মুখের দিকে। না, আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমার এত বছরের অভিজ্ঞ চোখ ভুল করে নি। যৌন-কদাচারের নির্মম প্রতিলিপি। বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে নতুন করে পাপ আর প্রবেশ করেনি, পুরনো পাপই অপরূপ লীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

ছায়ানট

জানি না কোনদিন এ চিঠি আপনি পড়বেন কিনা, কারণ প্রথমত আমি আপনার সঠিক নাম জানি না। আমার দু একজন লেখক বন্ধু আপনাকে যে নামে অভিহিত করে থাকেন, সে নামে আপনাকে পত্র দিলে আপনার পক্ষে মানহানির মামলা আনাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত···জনশ্রুতি এই যে, একমাত্র পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কিছু আপনি পাঠ করেন না, এমন কি স্বল্পখ্যাত কোন লেখকের রয়ালটির জন্ম তাগাদা দেওয়ার চিঠিও নয়।

তবু বাধ্য হ'যে আপনাকে চিঠি দিতে হ'ল, কারণ এ ছাড়া আমা'র আর কোন উপায় নেই। আমি নিজে গিয়ে আপনার কাছে সব কিছু বলতে পারলে খুবই ভালো হতো, কিন্তু ভগবান সে শক্তিও অবশিষ্ট রাখেন নি।

ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি।

মাস সাতেক আগে আপনি কৃতান্তনাথ সান্যালের একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'সুদূর দিগন্তে'। বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এর প্রমাণ—ইতিমধ্যেই আপনারা দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আশা করা যায় সংস্করণান্তর করার গোপন রহস্য আপনার অবিদিত নয়। কিন্তু আপনি প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক। এ ধরনের কিছু করবেন এমন কথা ভাবতেও পারি না।

বইটি আপনি পড়েছেন কিনা জানি না। সব বই আপনার পক্ষে

পড়াও সম্ভব নয়। উপরন্তু কৃতান্তনাথ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক। ইদানীং যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকদের ওপর বাংলা দেশের পাঠক-সম্প্রদায় আশা ভরসা রাখেন, কৃতান্তনাথ তাঁদের অন্যতম। আমার মনে হয় এ বই পড়লে আপনি কিছুতেই ছাপতে পারতেন না। বইটি আগাগোড়া একটি পরিবারের কুৎসার কাহিনী। কুৎসার উপর রং ফলিয়ে তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, যে কোন ভদ্র পাঠক পাতা ওলটাতেও লজ্জাবোধ করবেন। কিন্তু এ বইয়ের এমন বিক্রি দেখে আমার পক্ষে মর্মাহত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কি এদেশে ভদ্র পাঠকের সংখ্যা বিরল!

কৃতান্তনাথ যেমন ছদ্মনাম নয়, তেমনি বইয়ের পাত্র-পাত্রী কাউকে লেখক ছদ্মনামের মুখোস পরান নি। সবই স্পষ্ট, উলঙ্গ, অস্পষ্টতার বালাই নেই। আক্ষেপ আমার সেইখানেই। আর এ বইয়ের কাটতি হ'য়েছে এই কারণেই। নাম ধাম মিলিয়ে এমন মুখরোচক কাহিনী চাটনির কাজ করে, অবশ্য ভরপেট খাওয়ার পর। সম্ভবত এ সময়ে আমি কলকাতায় থাকলে অনেক পাঠক-পাঠিকা আলাপ করার নামে আমাকে দেখে যেতেন, যে উৎসাহ নিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় নতুন কেনা শিম্পাঞ্জী দেখতে যাই, কিংবা দুটো মাথাওলা সদ্যোজাত শিশু।

আমাকে দেখতেই বেশি লোক আসতো, কারণ সমস্ত বইটাতে আমিই একমাত্র চরিত্র যার ওপর লেখক বিদ্বেষ আর ঘৃণার সমস্ত কালি উপুড় করে দিয়েছেন। আপনার বইটা পড়া থাকলে বুঝতে পারতেন আমিই অজিতপ্রকাশ, নায়িকা হিমানীর স্বামী, কিন্তু নায়ক নই। সারা বইটাতে আমাকে দেখানো হ'য়েছে দুর্বৃত্ত হিসাবে, কারণে অকারণে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করি, স্ত্রীর রোজগারে সংসার চালাই। গ্রন্থকার উত্তমপুরুষে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এর স্বামীর হাত

থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজনের মাঝখানে। সংসার-মন্থনে অঞ্জলি ভরে বিষ কণ্ঠস্থ ক'রে, অন্য সকলকে বিলিয়েছেন অমৃত।

কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। আপনি ভাবতে পারেন আমি আত্মদোষ-স্খালনের চেষ্টা করছি, নিজেকে বাঁচাবার ধর্ম, কিন্তু সে চেষ্টা করে আমার কোন লাভ নেই, কারণ সোজাসুজি ডাক্তারেরা কিছু বলে নি, তবে কানাঘুষোয় আমি শুনেছি, আমার পরমায়ুর পরিধি আর মাসখানেক। ছোকরা একটি ডাক্তার আমায় আশ্বাস দিচ্ছেন দিনের পর দিন, আমি সেরে উঠবো। ওষুধপত্রে খুব উপকার হয়েছে। কিন্তু এসব আশ্বাসে আমার আস্থা নেই। রোজ সকালে তাজা রক্তের দিকে চেয়ে আমি বুঝতে পারি, আমার জীবনী-শক্তি ক্ষয়ে আসছে, স্তিমিতশিখা প্রদীপের মত নিভে যাবার আর দেরি নেই।

লেখকের সঙ্গে আলাপ আমার কলেজ জীবন থেকে। তখন থেকেই তিনি ছোট-খাটো কয়েকটি পত্রিকায় লিখে কিছু নাম করেছেন। ছাপার অক্ষরে পত্রিকায় যাঁদের নাম বেরোয়, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত উঁচু তা লিখে জানাবার চেষ্টা করবো না। তাঁরা আমাদের কাছে প্রায় স্বর্গচ্যুত দেবতার সামিল। তাঁদের পাশে বসতে পারলে, কথা বলতে পারলে আমরা ধন্য হয়ে যাই। বিয়ের সময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি, কারণ কৃতান্ত তখন চাকরি করছেন জব্বলপুরে। পরে কৃতান্তর সঙ্গে একদিন দেখা হ'য়ে গেলো। অনেকদিন পরে, শুনলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে নামবেন। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অনেক কথা সেদিন বলেছিলাম। যে কলমে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন হবে, সে কলমে দিনের পর দিন 'মিলিটারী একাউন্টসের' হিসাব রাখার কোন সার্থকতা নেই। প্রতিভার অপমান। এত কথার

সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণও তাঁকে জানিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও তাঁকে দেখতে খুব উৎসুক এমন কথাও বলেছিলাম।

মিথ্যা কথা অবশ্য বলেছিলাম। কারণ আমার স্ত্রীর সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহ আমার নিজের খেলাধুলা সম্বন্ধে উৎসাহের মতনই। কিছুদিন আগেও আমার ধারণা ছিলো ধ্যানচাঁদ মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী অব গোষ্ঠ পাল বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার। ম্যাট্রিকটা পাশ করার জন্য দু একটা সাহিত্যিকের ছিটে ফোঁটা যা কিছু গরল গলাধঃকরণ করতে হয়, আমার স্ত্রী তার বেশি করে নি। মধ্যে মধ্যে লাইব্রেরি থেকে ভালো ভালো বই দু একটা এনে দিয়েছি, বইগুলো সম্বন্ধে মতামতও জিজ্ঞাসা করেছি তাকে, কিন্তু আশাপ্রদ কোন উত্তর পাই নি। একদিন মনের কথা স্পষ্টই আমাকে বলেছে।

এই সব ছাই পাশ না এনে, পাকপ্রণালী একটা লাইব্রেরিতে পাও কিনা দেখো তো? কতকগুলো নতুন রান্না করে তোমায় খাওয়াবো।

পাকপ্রণালী আনা সম্ভব হয় নি, নতুন বই আনাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নিজের পড়ার ইচ্ছা হলে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়তাম কিংবা অফিসে বসে।

আশ্চর্য কাণ্ড, আমন্ত্রণ জানাবার দিন সাতেকের মধ্যে কৃতান্ত আমার বাসায় গিয়ে হাজির। হাতে তাঁর সদ্য প্রকাশিত একখানা উপন্যাস। সমাদর করে ঘরে বসালাম। এক ফাঁকে ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এলাম বাইরে। আলাপ করিয়ে দিলাম। কৃতান্তের কোন জড়তা নেই। দশ মিনিটের মধ্যে এমন কাণ্ড করলেন যেন দশ বছর ধরে তাঁর আসা যাওয়া আমার বাড়িতে।

জানিনা ধৈর্য ধরে এতটা আপনি পড়েছেন কিনা। এত খুঁটিয়ে সব কথা বলতে গেলে পাতাও অনেকখানি হ'য়ে যাবে, তাছাড়া আপনিও

বিরক্ত হ'য়ে উঠবেন। এরপর আমি সংক্ষেপে সারছি। ধরে নিন কৃতান্তনাথ একটি কুমির, আর আমি খাল কেটে তাকে আমা'র সংসারের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছি।

কৃতান্তনাথ আসতে লাগলেন। প্রথম দিকে মাসে একবার, তারপর ক্রমে ক্রমে সপ্তাহে একদিন, শেষ দিকে একদিন অন্তর। আগে পাঁচটার পরে, তারপর কোন বিশেষ সময়ে নয়, যে কোন সময়ে। তবে দুপুরের দিকেই বেশি।

একদিন গলির মোড়ে পাড়ার গুটি তিনেক ছোকরা আমাকে ঘিরে ধরলো।

একটা কথা!

কি আবার ব্যাপার! পুজোর তো ঢের দেরি, আবার চাঁদা দেবার কি মরসুম এলো? চাঁদা নয় অন্য ব্যাপাব।

আপনার বাড়িতে ওই যে ফরশামতন লম্বা লোকটি আসেন, উনিই কি কৃতান্তনাথ সান্যাল?

সগৌরবে ঘাড় নাড়লাম। হ্যাঁ উনিই। বিশেষ বন্ধু আমার। প্রায় আসেন। ছেলেরা উৎফুল্ল হ'যে উঠলো।

—স্যার আমাদের ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। আমাদের ক্লাবের উৎসবে ওঁকে সভাপতি করবো। দেখে দুচক্ষু সার্থক করবো।

তখন কৃতান্তনাথের বেশ নাম হযেছে। গোটা চারেক বই খুব চালু। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে নাম। একখানা বইযের মহরতও হ'য়ে গেছে।

এমন একটা লোককে বাড়িতে আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, ভাবতেও নিজেকে ভগীরথের সগোত্র বলে মনে হলো।

যোগাযোগ হলো। ক্লাবের উৎসবে আমরাও নিমন্ত্রিত হলাম।

বসলাম সামনের সারিতে। হোমরাচোমরাদের পাশাপাশি। কৃতান্তনাথ শুধু নামী লেখকই নন, সুন্দর বক্তাও, তার পরিচয় পেয়ে ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর অফিসে গিয়েই শুনলাম চেয়ারম্যান দেহ রেখেছেন, অফিস ছুটি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখোমুখি মোলাকাত হবার কোন সুযোগ ঘটে নি, কারণ সুদূর বিলাত থেকে ভদ্রলোক ভারতবর্ষের মাটিতে কোনদিন পদার্পণ করেন নি। তবু কষ্ট হ'লো, কারণ শুনেছিলাম এ কোম্পানির পত্তন তিনি করেছিলেন। রক্ত দিয়ে লালন ক'রে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন।

কিছুক্ষণ অফিসে ঘোরাফেরা করে বাড়িতে ফিরে এলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই অবাক। প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে।

মুশকিলে যত না পড়লাম, বিস্মিত হলাম তার চেয়েও বেশি। পথে পথে অবশ্য ঘুরতে হবে আমাকে, কারণ বাড়তি চাবির বালাই নেই, কিন্তু তালা দিয়ে কোথায় যেতে পারে হিমানী? আমাকে না জানিয়ে, এমন সময়ে!

নিরুপায়। জানাশোনা এক মেসে গিয়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিলাম, ফিরলাম ছটা নাগাদ। হিমানী ফিরেছে।

চা জলখাবার নিয়ে দাঁড়াতেই কথাটা বললাম।

স্পষ্ট দেখলাম হাতটা কেঁপে শাড়িতে চা ছিটকে পড়লো। দু গালে রক্তের ছিটে, দুপুরে এসেছিলে নাকি? হিমানী জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করলো।

ঘাড় নাড়লাম। অফিস যেতেই ছুটি হয়ে গেছে, সে কথাটাও জানালাম।

—দুপুরে সুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। জলখাবারের প্লেট নামাতে নামাতে হিমানী বললো।

—স্যুটিং ?

—মানে কৃতান্তদার সঙ্গে। ওঁরই বই।

কৃতান্তদা! আমার সঙ্গে কৃতান্তনাথের আলাপ বহু দিনের, কিন্তু আমি এখনো কোন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করতে পারি নি তাঁকে, সম্বোধনও করি কৃতান্তবাবু বলে। কিন্তু কৃতান্তদা!

মনে মনে তারিফ করতে শুরু করলাম। ইদানীং বাইরের ঘরে আমি বসে থাকলেও, কৃতান্তনাথ পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসেছেন। বেতের মোড়া নিয়ে চৌকাঠ চেপে। খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা কানে এসেছে। শিল্প আর সাহিত্য সম্বন্ধে রংদার কথা। রচনা শুধু নিছক কল্পনাই নয়, তার সঙ্গে লেখকের নিজের রক্ত মেশানো চাই। অভিজ্ঞতার রক্ত। অর্ধেক হয়তো কল্পনা, কিন্তু বাকি অর্ধেক জীবনের স্বরূপ। উত্তরে হিমানী ফিসফিসিয়ে কি বলেছে, কানে আসে নি। কৌতূহল খুবই ছিলো, কিন্তু খবরের কাগজের নেশা ছিলো আরো প্রবল। কাগজ ফেলে কথা শুনতে ভিতরে যেতে ইচ্ছা করে নি। আর সেটা শোভনও হতো না।

অনেকক্ষণ ধ'রে হিমানী স্যুটিংয়ের জাঁকজমকের কথা বললো। কৃতান্তনাথ সেটের মধ্যমণি। কারণে অকারণে ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান থেকে নায়ক-নায়িকারা পরামর্শ করে। সকলেই তারিফ করে তাঁর সংলাপের।

কিছুক্ষণ চলে যাওয়ার পরে হিমানীর খেয়াল হ'লো আমি খবরের কাগজের পাতায় ডুবে গেছি। একটি কথাও আমার কানে যায় নি। এটা কিন্তু সত্য নয়। খবরের কাগজটা কেবল একটা আড়াল। প্রত্যেকটি কথা শুধু কানেই নয়, মরমেও পৌঁছেছে।

'সুদূর দিগন্তে' বইটা যদি আপনি ভালো ক'রে পড়ে থাকেন, তা

হ'লে বুঝতে পারবেন এই পর্যন্ত কৃতান্তবাবু ঠিক সত্যি কথাই লিখেছেন। এরপর অজিতপ্রকাশের তরফ থেকে সন্দেহের অবতারণা করা হয়েছে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কৃতান্তবাবুর নাম জড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত। হিমানীর শিশুমনকে আমি নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নাকি নষ্ট করে দিয়েছি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন। এ সমস্ত কৃতান্তবাবুর কল্পনা, রং ফলাবার প্রয়াস। আমি স্ত্রীকে বাধা দিই নি, কঠিন কথা একটুও বলি নি একদিনের জন্য। কৃতান্তবাবু ঠিক আসতে লাগলেন। নিয়মিত। তাঁর বইয়ের চিত্ররূপ দেখিয়ে আনলেন আমাদের। দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস উচ্ছ্বাসের উত্তরে বিনয়নম্র ভাব ফোটালেন মুখে। হিমানী ছবিখানা দেখলো, কৃতান্তকে দেখলো তার চেয়ে বেশি। কৃতান্তনাথের হাতে তুলে দেওয়া ফুলের মালা নিজের হাতে তুলে নিলো। কৃতান্তের কৃতিত্বের অনেকটা তার পাওনা এমন ভঙ্গিও করলো।

কৃতান্তনাথের সদ্য প্রকাশিত সব বই বাড়িতে আসতে লাগলো। হিমানীর পাশাপাশি আমার নামও লেখা থাকতো কৃতান্তনাথের হস্তাক্ষরে, কিন্তু সেটুকু শুধু সৌজন্য। কেবল বইয়ের পাতাতেই রইলাম পাশাপাশি, নয়তো সব ক্ষণ হিমানীর পাশে রইলো কৃতান্তনাথ।

ব্যাপার একদিন চরমে উঠলো। এ ঘটনার উল্লেখও বইটাতে আছে, কিন্তু অন্যভাবে।

শরীর একটু খারাপ বোধ হওয়ায় অফিস কামাই করে বাড়িতেই রয়েছি। দুপুরে দরজা ঠেলে কৃতান্তনাথ ঘরে ঢুকলেন। হাতে ভেলভেটের বাক্স। আমাকে দেখে সামান্য একটু অপ্রস্তুত, কিন্তু মুখের রেখায় একটা নির্বিকার ভাব, চাউনিতেও সঙ্কোচের ছায়া নেই।

—কি হে, শুয়ে আছো? কথার উত্তর দেবার আগেই কৃতান্ত পাশে এসে বসলেন, ভেলভেটের বাক্স খুলে সামনে মেলে ধরলেন।

দামী হার। ঝকঝকে নতুন। প্রয়োজনের চেয়েও যেন বেশি পালিশ করা।

—এটা নিয়ে এলাম হিমানীর জন্য। কৃতান্তনাথের কথায় হাসির মিশেল।

বইটাতে আছে লক্ষ্য ক'বে থাকবেন, আমি চটে চিৎকার করে উঠলাম। হুঙ্কার ক'রে চৌকাঠের বাইরে যেতে বললাম কৃতান্তনাথকে। পাড়ার কযেকজনের সামনে অপমানিত করলাম, গালিগালাজ করলাম ইতর ভাষায। সবই করলাম কিন্তু সুবিধামত হারটা ফেরত দিলাম না। সে হার অবশ্য আমি স্ত্রীর গলাতেও পরাই নি, পরালাম জয়ন্তীর গলায, যে জয়ন্তী রূপমহলে সখীর দলে নাচে, যে জযন্তীর পিছনে আমার মাইনের বেশি অংশটুকু আমি অঞ্জলি দিই।

রূপমহলে কোন জযন্তী নাচে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু তেমন কোন জয়ন্তীকে আমি চিনি না, কাজেই তার সঙ্গে কোন অবৈধ সম্পর্কের কথা অবান্তর। এ জয়ন্তী হয়তো কৃতান্তনাথের সৃষ্টি। অজিতপ্রকাশের নামের ওপর বুলোবার আর এক পোঁচ কালি।

আমি ঠিক কি ক'রেছিলাম শুনুন। খুব শান্ত গলায কেবল আমি বলেছিলাম, হিমানীর জন্য হার?

—কেন, ভাই বোনকে দিতে পারে না কিছু? আম ব নিজের বোন নেই, আমি যদি এনেই থাকি।

এর মাঝখানে হিমানী এসে পড়লো। পাশেব ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলো, কৃতান্তেব গলার আওয়াজে এ ধবে এসে দাঁড়ালো। আমি কিন্তু লক্ষ্য করলাম এইটুকুর মধ্যেই সে হালকা প্রসাধন সেরে এসেছে। চুলটা আঁচড়েছে, মুখে সামান্য পাউডারের প্রলেপ, আধ ময়লা শাড়িটাও বদলেছে।

এসেই হারের দিকে নজর। হাত দিয়ে তুলে নিয়ে হার ছড়া নিজের গলায় পরলো। পিছু হেঁটে দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে বলল, বাঃ, প্যাটার্নটা তো বেশ! কার জন্য এনেছেন কৃতান্তদা?

অভিনয় আমি ভালো বুঝি না, নারীচরিত্র সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল নই, কিন্তু সে মুহূর্তে মনে হলো হিমানী নিপুণ অভিনেত্রী। রঙ্গমঞ্চে কিংবা সেলুলয়েডে কেমন করবে জানি না, কিন্তু সংসারমঞ্চে স্বামী আর অনাত্মীয় এক পুরুষের সামনে মুখচোখের যা ভাবভঙ্গি দেখালো, তা তুলনাহীন।

আমি সেদিন অসুস্থ হ'য়ে বাড়িতে না থাকলে, এমন একটা অভিনয়ের সুযোগ হিমানী পেতো না, সেকথাও মনে পড়লো। হারের এ প্যাটার্ন কৃতান্তনাথের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিমানীর পছন্দ করা কিনা, তাও ভাবলাম।

এর দিন কয়েক পরেই কৃতান্তনাথ একদিন এলো আর একটা কাগজের মোড়ক হাতে করে। আমি বাইরে বেরোচ্ছিলাম, আমাকে আবার টেনে আনলো ভিতরে।

—এই নাও।

—কি?

—আরে খুলেই দেখোনা।

খুললাম। দামী ওকের পাইপ। সঙ্গে টোব্যাকো পাউচ।

—কিন্তু এ নেশা তো আমার নেই কৃতান্তবাবু।

—ধরবে বলেই তো আনলাম। তোমার ভারী মুখে পাইপ মানাবে ভালো।

কথা না বাড়িয়ে উপহার তুলে নিলাম। আক্রো তোলাই আছে। নাকের বদলে নরুনে আমার লোভ কম।

এর পরের ইতিহাস আরো দ্রুত। সিনেমায়, স্যুটিংয়ে, হোটেলে যেখানেই কৃতান্তনাথের যাওয়ার প্রয়োজন সেখানেই পার্শ্বচারিণী হিমানী। এমন কি দু একটা হাল্কা সিনেমার কাগজে ওদের দুজনের পাশাপাশি ছবিও বেরিয়ে গেলো। কানাঘুষো শুনলাম কৃতান্তনাথের দু একটা বইতে নাকি হিমানীরও ছোট-খাটো পার্ট থাকবে।

একদিন কথায় কথায় হিমানীকে জিজ্ঞাসাও করে ফেললাম। স্বরে পরিহাসের তরলতা মিশিয়ে।

হিমানী ভ্রূ কুঁচকে ফিরে দাঁড়ালো। ওই যে কৃতান্তদার সঙ্গে ঘুরি ফিরি কিনা, তাই পাঁচজনের চোখ টাটাচ্ছে। ইনিযে বিনিযে কাহিনী রচনা করছে। অবশ্য কৃতান্তদাকে একবার বললেই, এখনি বন্দোবস্ত করে দেবেন। ডিরেক্টররা ওঁব কথায় ওঠে বসে।

আর কিছু বললাম না, অন্য মানুষের হয তো চোখ টাটায, কিন্তু যার বুক টাটায় তার দিকেও লক্ষ্য নেই হিমানীর।

এর মধ্যে খিদিরপুরের এক ক্লাব থেকে জয়ন্তী উৎসব হলো কৃতান্তনাথেব। শুধু ফুলেব তোড়াই নয, টাকাব তোড়াও দিলো। খবরটা আমি আগে কিছু শুনিনি। খাওযা-দাওযার পর বাতি নিভিয়ে বসেছিলাম বাইরের ঘরে, মোটরের আওয়াজে উঠে দাঁড়ালাম। হিমানী। ঝলমল পোশাকে প্রসাধনে যেন নতুন মানুষ। হাতে জড়ানো মালা আর ফুলের তোড়া। কৃতান্তনাথের গৌরব-দীপ্তির কিছুটা হিমানীব মুখেও।

এই সময় বন্ধু-বান্ধব দু একজন কানাকানি করতে লাগলো। বাড়ি বয়ে আমাকেও উপদেশ দিয়ে গেলো। হাটে, মাঠে, ঘাটে কৃতান্তনাথের পাশাপাশি হরদম যে হিমানীকে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপাব কি? এত উদার আমি কোনদিনই ছিলাম না। এ উদারতার কডা

দাম দিতে হয়, তার জন্য প্রস্তুত আছি আমি? অতীত থেকে কয়েকটা জ্বলন্ত উদাহরণও বন্ধুরা দেখালো।

ঘুমোবার আগে এক রাত্রে মন ঠিক করে ফেললাম। হিমানী শাড়ি পাট করে রাখছিলো, তাকে কাছে ডাকলাম।

ইদানীং ডাকলে হিমানী কাছে আসে, আগে কিন্তু না ডাকলেও আসতো, খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালো।

ভূমিকা বাদ দিয়ে সোজাসুজিই বললাম, একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে।

—পাঁচজনে মোটেই পাঁচকথা বলছে না, যা বলবার বলছো তুমিই। তোমার মতন এমন ইতর মন আর কার আছে?

উত্তেজিত হবার মতন উত্তর, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। ক্ষত নিজের বুকের। যত বাড়াবো ততই ঘা বাড়বে।

আমি থামলেও হিমানী থামলো না। কৃতান্তনাথ মানুষ হিসাবে যে কত উঁচু তার ফিরিস্তি চললো। এমন দেবতার নামে যে কলঙ্কের ইঙ্গিত করে সে যে কত নিচু স্তরের তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এইখানে সম্ভব হ'লে বইটা খুলে দেখবেন। দুশো চার পাতা। সেখানে দেখবেন অজিতপ্রকাশ হিমানীর গলা টিপে ধরেছে। চিৎকার করে বলছে, তোকে একেবারে শেষ করে দেবো। এত বড় স্পর্ধা, কথার ওপর কথা। শুধু গলা ধরে ঝাঁকুনিই নয়, ঠেলে আমি হিমানীকে ফেলে দিলাম। ঘরের কোণে রাখা মদের ডিকাণ্টরের ওপর পড়ে তার কপাল কেটে গেল। এতক্ষণ ছিলো চোখের জল, এবার তাতে মিশলো দেহের রক্ত।

কপাল চেপে দাঁড়িয়ে উঠে হিমানী, জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। আগুন সাক্ষী করে বিয়ে করে আনলেই দায়িত্ব হয়

না, শয্যাসঙ্গিনীকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিতে হয়। দুপায়ে দেহটাকেই নিষ্পেষণ করা চলে, মনকে নয়। যে আঘাত করেছে অজিতপ্রকাশ সে আঘাত শুধু হিমানীর অঙ্গেই নয়, সে আঘাত লেগেছে যুগযুগান্তরের নারীত্বের মর্যাদায়। এ অপমান হিমানী সইবে না, কিছুতে নয়।

বাইরে দুর্যোগময়ী রাত্রি। আধময়লা আবরণে নিজের দুঃখজর্জর দেহ ঢেকে হিমানী অন্ধকারে মিশিয়ে গেলো।

আমি জানি, এইখানটা অনেকের কণ্ঠস্থ, বিশেষ ক'রে সদ্য-কলেজে ওঠা ছেলেমেয়েদের। হিমানীর বাছাই করা কথাগুলোই তারা মনে রাখেনি, ফাঁকে ফাঁকে অভিশাপও দিয়েছে লম্পট, মদ্যপ অজিতপ্রকাশকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন হিমানীর ঘরছাড়ার কারণ এ নয়।

কৃতান্তনাথ মানুষ হিসাবে যে কত উঁচু তার পরিচয় পেলাম সপ্তাহ খানেকের'মধ্যে।

কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে অফিস ছুটি। হিমানী কোণের দিকে চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছিলো। কৃতান্তনাথের। অত টাকা পাউণ্ডের উল কিনে সোয়েটার পরার মতন অবস্থা আমার নয়। কৃতান্তনাথকে যে কিনতেই হয়েছে এ নাও হতে পারে। কিছুদিন আগেও কৃতান্তনাথ দেখিয়ে গেছেন গোটা তিনেক মাফলার, একটা দস্তানা। সবই তাঁর ভক্ত পাঠিকাদের উপহার, দস্তানাটা শুধু তাঁর শেষ বইয়ের নায়িকা অতসী দেবীর দেওয়া।

কৃতান্তনাথ ঘরে এসে ঢুকলেন। তখনো মোটর কেনেন নি, যাতায়াত ট্যাক্সিতে।

শ্রীরামপুরে কি একটা সভা আছে, সেখানে যাবার আগে যাত্রাভঙ্গ করলেন কয়েক মিনিটের জন্য।

বসলেন না, সময় নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, দেখেছো হিমানীর কি চেহারা হয়েছে ?

অনেকবার দেখেছি। আর একবার দেখলাম। মনের পরিবর্তন ধরতে পারার কথা নয়,—অন্ততঃ সে অভিজ্ঞ চোখ আমার নেই, কিন্তু দেহের কোন পরিবর্তন হ'লে নজরে পড়তো।

—কেন, কি হ'য়েছে হিমানীর ?

—হয় নি কি তাই বলো। শরীরে রক্ত নেই, হজম হচ্ছে না। খাওয়ার পরে পেটে একটা ব্যথার মতনও হচ্ছে।

আশ্চর্য, এত ব্যাপার অথচ ঘুণাক্ষরে একটি কথা হিমানী আমাকে বলে নি। মুখ বুজে সব সহ্য করেছে, স্বামীদেবতাকে বিচলিত করে নি।

হিমানীর দিকে মুখ ফেরালাম। এমন মুখের ভাব করলো যেন এখনও রয়েছে যন্ত্রণা।

—তোমার শরীর খারাপ তাতো বলো নি ?

—বললেই সব হতো। হিমানী ঠোঁট ওলটালো, তুমি ওষুধে-পত্তরে আমাকে একেবারে ঢেকে ফেলতে।

শুধু ফণাই তুললো না হিমানী, দাঁতের সবটুকু বিষও ঢেলে দিলো।

কথা বলতে গিয়েই বাধা পেলাম। চেয়ারের ওপর একটা পা তুলে কৃতান্ত আরম্ভ করলেন, একটা স্যুটিংয়ের ব্যাপারে শিমুলতলা যাবো। দিন পনরোর জন্য। যদি আপত্তি না থাকে হিমানীও চলুক না আমাদের সঙ্গে। যদি কিছুটা উপকার হয়।

হিমানীর দিকে পলকের জন্য চোখ ফেরাতেই মনে হলো, যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই, বরং চাপা হাসির ঝিলিক দুটি চোখে।

হিমানী না থাকলে আমার অসুবিধা একটু হবে। চাকরের ওপর সংসার ছেড়ে দিতে হবে, যাতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। স্বভাবতই

আমি পরনির্ভর। কিন্তু স্ত্রীর শরীর সারবার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে মন সরলো না। বলা যায় না, হয়তো সত্যিই হিমানীর শরীর খারাপ। বাইরে থেকে কতটুকু বোঝা যায় মানুষের। তা ছাড়া, কৃতান্তনাথ একা নন। প্রায় সমস্ত ইউনিট চলেছে সঙ্গে। মাত্র পনরো দিনের ব্যাপার।

সবই বুঝলাম, কিন্তু একটা কাঁটা বিঁধে রইলো বুকের মাঝখানে। নড়তে চড়তে খচ ক'রে উঠতে লাগলো। এর চেয়ে রক্তক্ষরণ হওয়াও বোধ হয় ভালো ছিলো।

আমার মৌনভাব ওরা সম্মতির লক্ষণ ব'লেই ধ'রে নিলো। হিমানী ঘর ছাড়লো।

দিন পনরো থাকার কথা, কিন্তু দিন বিশেক পরে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে ওদের দিয়ে যাওয়া ঠিকানায় চিঠি, সে চিঠি দিন চারেক পরে ফেরত এলো সর্বাঙ্গে সীলমোহরের ছাপ নিয়ে। ছাপ নয়, ওগুলো যেন কালশিরা। আমার মনই ফিরে এলো সারা গায়ে অপমানের কালি মেখে।

স্টুডিয়োয় দিন চারেক হাঁটাহাঁটি ক'রে খবর মিললো। শিমুলতলায় নয়, কৃতান্তনাথ গেছেন বম্বে, ওদেশের চিত্র প্রযোজকদের আমন্ত্রণে। কতদিন থাকবেন বলা দুষ্কর। এমনও হ'তে পারে, আর হয়তো ফিরবেনই না। একটার পর একটা কাহিনী রূপায়িত হবে সেলুলয়েডে।

মাস তিনেক কাটলো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে। কিছুটা নিজের মনের সঙ্গেও। মাঝে মাঝে ভাবতাম, ছুটি নিয়ে একবার বম্বে চলে যাই। দাঁড়াই হিমানীর মুখোমুখি। কিন্তু ইচ্ছা হলো না। আমাকে দেখলেই হয় তো বাড়বে পুরানো ব্যথাটা। নীরক্ত হবে চোখের পাতা, বিবর্ণ দুটি ঠোঁট।

কিছুদিন আগে এক সিনেমা জার্নালে কৃতান্তনাথের ছবি দেখলাম।

একটা বইয়ের মহরতে ডিরেক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে। এপাশে ওপাশে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রয়েছে, কিন্তু সেরা অভিনেত্রীটি ধারে-কাছে কোথাও নেই।

কিছুটা খবর পেলাম বম্বে-ফেরত এক বন্ধুর মুখে। জুহুতে দেখেছে দুজনকে। হাতে হাত। সমুদ্র-সৈকতে পাশা-পাশি। সমুদ্রের হাওয়া হিমানীর পক্ষে ভালো কিনা ডাক্তাররা বলতে পারবেন, কিন্তু কলকাতার জলহাওয়ায় আমার দম বন্ধ হ'য়ে এলো।

ঠিক দিন তিনেকের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটলো; অফিসে কাশির সঙ্গে ফোঁটা দুয়েক। প্রথমে মনে হ'লো বোধ হয় গলা চিরে গিয়ে থাকবে। অবশ্য বুক তো চিরে গেছেই, এ রক্তক্ষরণে কিছুটা কমবে হয় তো বুকের ব্যথা। কিন্তু পরের দিনও একই ব্যাপার। বাথরুমে পৌঁছোবার আগেই রুমালে পড়ে গেলো। বেশ কয়েক ফোঁটা। ডেসপ্যাচার মনোহরবাবু আঁতকে উঠলেন। ছাপোষা বাঙালী, এমন টাটকা রক্ত কখনও দেখেন নি।

মুহূর্তে খবরটা অফিসে রটে গেলো। সমবেদনার পশলা। সহানুভূতির স্রোত। আমার ধারণা ছিলো হিমানীর ব্যাপারটা বোধহয় কেউই জানে না, কিন্তু ভুল ধারণা। আমাকে সমবেদনা জানাবার ছল ক'রে সবাই পাড়লো হিমানীর কথা। স্বামীর এই সর্বনাশ, আর কি ক'রে সে দূরে সরে রইলো। এমন একটা রোগের কারণই যে হিমানী, এ বিষয়ে সবাই একমত। আঘাত থেকেই তো এ রোগের সৃষ্টি। এর চেয়ে বড়ো আঘাত স্বামীর পক্ষে আর কি হ'তে পারে!

সারা বইতে আপনি আমার রোগের এ খবর পাবেন না। রোগের একটা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেটা লিভার সংক্রান্ত। অত্যধিক

সুরা পানের ফল। অদমিত অত্যাচার-জনিত ব্যাধি। আপনার পক্ষে যাদবপুরে আসা সম্ভব কিনা জানি না। শুনেছি আপনার দামী গাড়ি আছে। যদি কোনদিন এ দিকে আসার সুযোগ হয়, মিনিট পাঁচেকের জন্য ফটকের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে যাবেন। ততদিন আমি হয় তো থাকবো না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেন এনকোয়ারি অফিসে, কিংবা ডাক্তার মল্লিককে—তের নম্বর বেডের রোগী অজিতপ্রকাশ সেনের পাঁজরা ফোঁপরা, কীটদুষ্ট ছিলো, কিন্তু তার লিভার সম্পূর্ণ সতেজ। এ্যালকোহলের ছিটে ফোঁটা কোথাও নেই।

চিঠিটা দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছে। কেবলই ভয় হচ্ছে আমার পরমায়ুর চেয়ে দীর্ঘ না হয়, তা হ'লে আপসোসের অন্ত থাকবে না। বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় এখানে বেড পেয়েছি, শুনলাম অফিসের ছোট সায়েবও তদ্বির করেছিলেন। এখানকার এক ডাক্তার তাঁর বিলাতের বন্ধু। একটানা ষোল বছর কাজ করেছি ওই অফিসে। বুকের রক্ত দিয়ে, সে প্রমাণও হয়েছে।

আজ সকাল থেকে যন্ত্রণাটা বড় বেড়েছে। চিঠি লিখতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার নার্সরা প্রথম প্রথম ছুটে আসতো লিখতে দেখলে। ধমক দিতো। সরিয়ে দিতো কাগজ কলম। আজকাল ওরা আর কিছু বলে না। আমার অন্তিম ইচ্ছায় বাধা দিতে চায় না।

'সুদূর দিগন্তে' বইটার শেষ পরিচ্ছেদটুকু অনুগ্রহ করে পড়বেন। একবার পড়া থাকলেও। দেখবেন প্রতি ছত্রে হিমানীর সম্বন্ধে বিষ ছড়ানো হ'য়েছে। কাঠ-মল্লিকাকে চন্দ্রমল্লিকা করতে চেয়েছিলেন কৃতান্তনাথ, ধূপকাঠিকে খধূপ। সম্ভব হয় নি। কৃতান্তনাথের উচ্চ আদর্শের নাগাল পায় নি হিমানী। দু হাতে কাদা ঘেঁটেছে, নিজের সর্বাঙ্গে ছিটিয়েছে। কিন্তু কৃতান্তনাথকে বিচলিত করতে পারে নি তাঁর

সাধনা থেকে, বিচ্যুত করতে পারে নি। কিন্তু ক্ষমা নেই কৃতান্তনাথের অভিধানে। বিশেষকরে যারা তাঁর সাধনার অন্তরায়, তাদের ওপর কোন রকম কৃপা দেখানো সম্ভব নয়।

স্বীকার করবেন রচনা নৈপুণ্য কৃতান্তনাথের অসাধারণ, ভাষার কেরামতি অসামান্য। পড়ার সময়ে মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় নেই, সত্য মিথ্যার চর ছাপিয়ে রসের প্লাবন। দাঁড়াবার মাটি সরিয়ে সেই জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়ে দেবে আপনাকে। বইয়ের এই পরিচ্ছেদ পড়ার পরে আমার মনেও একটা দ্বিধা এসেছিলো, সংশয়ের দোলা।

হিমানী কৃতান্তনাথের আদর্শের মর্যাদা বুঝি সত্যিই রাখতে পারে নি।

কিন্তু আমার ভুল ভেঙেছে। কাল বেলা চারটের সময় সব দ্বন্দ্বের অবসান।

হিমানী এসেছিলো।

ছিন্ন ময়লা পরিচ্ছদ। দু চোখে কালির পোঁচ। কঙ্কাল দেহ। আমাকে দেখে অঝোরে কান্না। তার কান্না থামাতে গিয়ে আমার চোখ ভরে এলো জলে।

তার কাছেই সব শুনলাম। কৃতান্তনাথ সরে দাঁড়িয়েছেন পাশ থেকে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন হিমানীকে, পুরনো পুতুল নিয়ে খেলা করতে তাঁর ভালো লাগে না। কোনদিনই লাগে নি।

নতুন পুতুল জুটেছে। ব্যারিস্টার গজদারের বিদুষী স্ত্রী ভিভিয়ান গজদার। রেসের মাঠে, স্টুডিয়োর ফ্লোরে, সমুদ্রের কিনারে, সর্বত্র দুটিকে একসঙ্গে দেখা যায়।

কৃতান্তনাথের ইচ্ছা শীতকালটা কেটে গেলেই দু'জনে ইউরোপ পরিক্রমায় বেরোবেন। নতুন চোখে দেখবেন বিদেশী শিল্পকলা আর সাহিত্য। নতুন প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করবেন।

হিমানীকে কোন আশ্বাস দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমি নিজেই মুমূর্ষু, পরিমিত আয়ু, কোন্ সাহসে হিমানীকে নতুন ক'রে বাঁচার মন্ত্র দেবো ?

আপনার কাছে অন্তিম অনুরোধ, দ্বিতীয় সংস্করণে যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ তৃতীয় সংস্করণে বইটা বদলাবার চেষ্টা করবেন। সোজাসুজি এ চিঠি দেখাবেন কৃতান্তনাথকে। বলবেন, অজিতপ্রকাশ নেই, হিমানীর যা চেহারা দেখেছি, সেও হয়তো বেশি দিন থাকবে না, কালি ছিটোবার লোকই যদি না থাকে তা হ'লে মিথ্যে কলঙ্ক লেপনের কি প্রয়োজন ! যা সত্য, তাই সাহিত্যের আধার হোক। মন্থনে যদি বিষই ওঠে তবে ভয় কিসের ? প্রকৃত সাধক অঞ্জলি ভ'রে বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠই হয়, ফাঁকি আর মিথ্যাচারের অমৃত সেবন ক'রে অমর হ'তে চায় না।

আমার এই শেষ অনুরোধটুকু আশা করি রাখবেন। আর কিছু বলবার নেই।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওআর্কস,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬